বিজ্ঞান মেলা

সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ১৯৮১ ● ভাদ্র/আশ্বিন ১৩৮৮
তিন টাকা

ছোটদের জন্য বাংলাভাষায় প্রথম মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা

শারদীয়া সংখ্যা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

অফিসের কাজে ? ব্যবসার কাজে ? কিংবা নিছক বেড়াতে হলেও
উঠুন—ট্যুরিষ্ট লজে। নিরাপদ সুন্দর পরিবেশে শুধু
আপনার সেবায় নিয়োজিত ট্যুরিষ্ট লজ্।

বেছে নিন কোথায় উঠবেন ঃ

১। ট্যুরিষ্ট লজ্, ভানুসরণি, দার্জিলিং। ফোন ২৬১১/৩
২। মেপল্, ওল্ড কাছারী রোড, দার্জিলিং। ফোন ঃ ২০৯২
৩। শৈলাবাস, ডাঃ জাকীর হোসেন রোড, দার্জিলিং। ফোন ঃ ২৬৮৪
৪। টাইগার হিল ট্যুরিষ্ট লজ্, সেঞ্চল ; পোঃ ঘুম, দার্জিলিং। ফোন ঃ ২৮১৩
৫। লুইস জুবিলী স্যানিটারিয়াম, ডাঃ এস. কে. পাল. রোড, দার্জিলিং।
ফোন ঃ ২১২৭
৬। ট্যুরিষ্ট লজ্, কালিম্পঙ। ফোন ঃ ৩৮৪
৭। শাংগ্রিলা, কালিম্পঙ। ফোন ঃ ২৩০
৮। ট্যুরিষ্ট লজ্, শিলিগুড়ি। ফোন ঃ ২১০১৮, ২১১১৪, ২১১১৮
৯। ট্রাভেলার্স হ্যাভেন, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি। ফোন ঃ ৩০
১০। ট্যুরিষ্ট লজ্, মালদা। ফোন ঃ ২২১৩
১১। ট্যুরিষ্ট লজ্, বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ। ফোন ঃ বহরমপুর ৪৩৯
১২। ট্যুরিষ্ট সেণ্টার, মালবাজার। ফোন ঃ ১৮৩
১৩। ট্যুরিষ্ট লজ্, দুর্গাপুর। ফোন ঃ ৫৪৭৬ ও ৫৭৬০
১৪। ট্যুরিষ্ট লজ্, বিষ্ণুপুর। ফোন ঃ ১৩
১৫। ট্যুরিষ্ট লজ্, দীঘা। ফোন ঃ ৫৫ ও ৫৬
১৬। সাগরিকা, ডায়মণ্ডহারবার। ফোন ঃ ৪৬ ও ৬২
১৭। ট্যুরিষ্ট লজ্, বক্‌খালি।
১৮। ট্যুরিষ্ট লজ্, শান্তিনিকেতন। ফোন ঃ ৩৯৮ ও ৩৯৯
১৯। ট্যুরিষ্ট লজ্, বক্রেশ্বর। ফোন ঃ তাঁতিপাড়া ২৬

যোগাযোগ করুন ঃ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিজ্‌ম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
রিজার্ভেশন কাউণ্টার
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (পূর্ব)
কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ ২৩-৫৯১৭

বিজ্ঞান মেলা—বাংলায় ছোটোদের জন্য প্রথম মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। বেরোচ্ছে প্রতি ইংরাজী মাসের একদম গোড়ায়।

সম্পাদকীয় দপ্তর

৫৩-সি, মতিলাল নেহেরু রোড
কোলকাতা-৭০০০২৯
ফোন—৪৭-৬৯৮০

সম্পাদকমণ্ডলী (সাম্মানিক)

সুভাষ সান্যাল
কৃষ্ণা ঘোষাল
সুভাষ দাস

সম্পাদক (সাম্মানিক)

অমিত চক্রবর্তী

মৃণালকান্তি সাহা কর্তৃক ৮/৫, হিঙ্গন জমাদার লেন, কোলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কোলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞান মেলা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১ * ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৮

ছড়া ঃ লিমেরিক | প্রদীপ রায় ২৫৯

গল্প ঃ বুদ্ধবাবু | শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৬০
বঙ্কুবাবুর গল্প | বিমলেন্দু মিত্র ২৬৫
দেবতার চোখে জল | অপূর্বেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭১
কাচের পৃথিবী | হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২৭৮
মিসিং লিংক | ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ২৯৬
ট্রাইপ্যানোসোমা | সুভাষ সান্যাল ৩১৯
পিঁপড়ে পুরাণ | প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩২৯

বিদেশী গল্প ঃ মৃত্যুঘর | হারমান ম্যাক্সিমভ ২৮৬
যা বৃষ্টি চলে যা | আইজ্যাক অ্যাসিমভ ৩০৩

জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ প্রাগৈতিহাসিক মাছ | সুশীল ঘোষ ২৬৯
এই পৃথিবীর প্রান্তদেশ | অসীম বসু ২৭৫
যারা ডুব দেয় সাগরে | গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৩
গান শুনতে গাছও ভালবাসে | উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩০১
ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন | বিশ্বজিৎ দাস ৩১১
সাপের যম | অসীম চক্রবর্তী ৩২৭

বিজ্ঞানী ঃ শিল্পী থেকে বিজ্ঞানী | মনোজ ঘোষ ২৯৩
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আর্যভট | গৌরীশঙ্কর ৩১৩

আবিষ্কার ঃ ব্ল্যাডগ্রুপ আবিষ্কারের কাহিনী | ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ২৬২

নিয়মিত বিভাগ
বিজ্ঞানের খবর ২৫৮ জানো কি ? ২৬৪
কোনোসময়ে…৩৩০ ধাঁধা ৩৩১

প্রচ্ছদ | শুভাপ্রসন্ন / মনোজ বিশ্বাস
অলঙ্করণ | কল্যাণ চক্রবর্তী

খবর

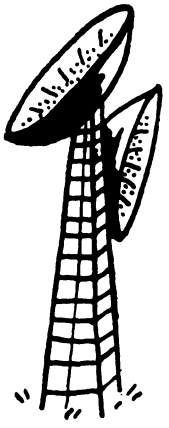

অন্ধজনে……

অন্ধ মানুষদের পথে-ঘাটে হাঁটা চলায় সাহায্যের জন্য এক অভিনব যন্ত্র তৈরী করেছেন আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কোর দুই বিজ্ঞানী—কার্টার কলিন্স এবং মাইকেল ডিয়ারিং। কোন অন্ধ মানুষের চলার পথে কোন বাধা পড়লে এ যন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে তার বিবরণ মানুষটিকে জানিয়ে দেবে। যেমন যন্ত্রটি হয়তো বলল—খুঁটি—১১টা—৩ মিটার। এর মানে অন্ধ মানুষটির সামনে ৩ মিটার দূরে একটা খুঁটি আছে যার অবস্থান ঘড়িতে ১১টা বাজার মত—অর্থাৎ একটু বাঁদিকে হেলে আছে।

এই যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে তা জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই? আসলে এর মধ্যে রয়েছে ছোট একটা টেলিভিশান ক্যামেরা, একটা কম্পিউটার আর ছোট্ট একটা স্পীকার। টেলিভিশান ক্যামেরাটা অন্ধ মানুষটির কাঁধের উপর বসানো থাকবে, কম্পিউটার থাকবে কোমরের বেল্টে এবং স্পীকার থাকবে কানের কাছে। মানুষটির চলার পথে ক্যামেরাটি যে সব জিনিসের ছবি তুলবে তাকে নিমেষে ইলেকট্রনিক সংকেতে রূপান্তরিত করা হবে যাতে কম্পিউটার ছবির বিষয়বস্তুগুলির বিশ্লেষণ করে ঠিক করতে পারে জিনিস-গুলো কি, কত দূরে ও কোনদিকে এবং সেইমত স্পীকারের মধ্যে দিয়ে মানুষটিকে তা জানিয়ে দেবে। যন্ত্রটি এইভাবে খবর জানাবে প্রতি সেকেণ্ডে দু' বার করে।

গাছপালার জুড়ি!

আজ যদি গাছপালার মত আমরাও আমাদের নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী করতে পারতাম তাহলে কি মজাটাই না হতো! কিন্তু তা তো আর হবার নয়, আমাদের শরীরে তো আর 'ক্লোরোফিল' নেই। সূর্যের আলোর শক্তিকে সরাসরি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করারও তাই কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা হেরে গেলেও 'হলোব্যাকটেরিয়াম হলোবিয়াম' বলে এক ধরণের ক্ষুদে ব্যকটেরিয়া আছে যারা কিন্তু নিজের খাবার নিজে তৈরীর ব্যাপারে সবুজ গাছপালার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। নিজেরা কিন্তু এরা সবুজ রঙের নয়! তাহলে রহস্যটা কি? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এদের শরীরে লাল রঙের এক বিশেষ রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিনা ক্লোরোফিলের জুড়ি হিসেবে কাজ করে। এই বিশেষ রঞ্জক পদার্থটিকে বিজ্ঞানীরা খুঁজেও বার করেছেন, নাম দিয়েছেন 'ব্যাকটেরিওরডোপসিন'। বিজ্ঞানীদের এখন চেষ্টা হল এই 'ব্যাকটেরিওরডোপসিন'কে মানুষের কাজে কিভাবে লাগানো যায়। কেউ কেউ বলছেন এই রঞ্জক পদার্থকে বিশেষভাবে ব্যবহার করে সমুদ্রের নোনা জল থেকে মিষ্টি জল বের করে নেওয়া যাবে।

তাহলে দেখ, 'ব্যাকটেরিওরডোপসিন' আমাদের খাদ্য তৈরী ব্যাপারে সাহায্য না করলেও জলের সমস্যা মেটাতে হয়তো একদিন সাহায্য করতে পারে, তাই না?

মহাকাশে মাকড়সা

মহাকাশ যাত্রার সৌভাগ্য মাকড়সারও হয়েছিল। স্কাই-ল্যাবে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল অ্যারাবেলা মাকড়সারাও। দিব্যি স্কাইল্যাবে চড়ে উড়ে চলল; কোনও উল্টো-পাল্টা চালচলন ছিল না। ভারহীন অবস্থায় প্রথমে কিছুটা থতমত খেলেও একটু পরেই ওরা শুরু করেছিল চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী জাল বোনা। তবে পৃথিবীতে মাকড়সারা যেমন চট্‌পট বুনে ফেলে—সেরকমটি পারে নি। জাল বোনার ব্যাপারে ওদের একটু জড়তা ছিল।

লিমেরিক

প্রদীপ রায়

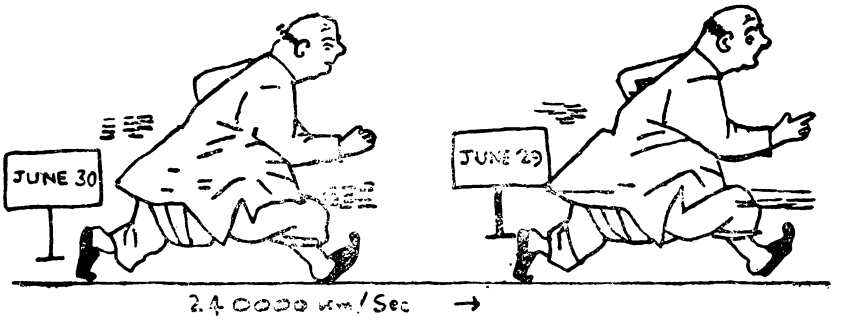

ক্লাসের মাঝে পাড়ল গালি বদরাগী কোন ছাত্রে,
সেই অপমান লাগায় জ্বালা শিক্ষকেরি গাত্রে।
মাষ্টা'মশাই দারুণ রেগে—
ছোটেন আলোর দ্বিগুণ বেগে
একটু পরেই পৌঁছে গেলেন আগের দিনের রাত্রে॥

●

আর্কিমিডিস, আর কি লিখিস, কার কি জিনিস ভাসছে ছাখ্,
তোর প্লাবিতা চড়ছে চিতা করছে বৃথা কি প্যাঁক প্যাঁক।
যতই হাইড্রোমিটার ভাসা,
জলের সঙ্গে দেয় বাতাসা,
হায় কলি ঘোর, বুদ্ধিতে তোর গয়লাগুলোর ফুলছে ট্যাঁক॥

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধবাবু একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন। রাস্তাঘাট আজকাল বড়ই নোংরা। বুদ্ধবাবু পৃথিবীর পরিবেশও পছন্দ করেন না তেমন। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই হয়। বাড়িঘর লোকজন গিজগিজ করছে। নিরিবিলি বেড়ানোর জায়গা বড় একটা নেই।

বুদ্ধবাবু ঢেঁকি ঘরে ঢুকে ঢেঁকিটাকে হ্যাঙ্গার থেকে খুলে বাইরে এনে চালু করলেন। ঢেঁকি বলতে কি আর সত্যিই ঢেঁকি; তবে দেখতে অনেকটা ঢেঁকির মতোই। মাঝখানে ঘোড়ার জিন-এর মতো একটা বসবার আসন। চালু করতেই ঢেঁকি ঊর্ধমুখ হয়ে আগুনের হল্কা ছাড়তে ছাড়তে আকাশে উঠতে লাগল।

বুদ্ধবাবু বেশীদূর উঠলেন না। যখন বাতাসটা বেশ পরিষ্কার আর তাপটা মোলায়েম মনে হল অমনি ঢেঁকিটাকে থামালেন। সেও দিব্যি জলে যেমন কলাগাছ ভাসে তেমনি বাতাসে ভাসতে লাগল। বুদ্ধবাবু একটা বোতাম টিপতেই বংশবদ ঢেঁকিটার মুখ খুলে গেল আর মস্ত জিব বের করার মতো একটা লম্বাপানা কারপেট বের করে ভাসিয়ে দিল বাতাসে। সরু এবং লম্বা ক্রিকেট পিচ-এর মতো সেই ভাসমান কারপেটে ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলেন বুদ্ধবাবু।

'ঝালমুড়ি? ঝালমুড়ি? দেব স্যার একঠোঙা?' বলে নোংরা চেহারার একটা লোক তার ঝাঁটামুখো হাওয়াই গাড়িটা বুদ্ধবাবুর উড়ন্ত কারপেট ঘেঁসে দাঁড় করাল। হাতে ঝালমুড়ির টিন, কাঁধে গামছা, মুখে অমায়িক হাসি।

বুদ্ধবাবু ভারী বিরক্ত হলেন। বললেন, 'না হে অন্যত্র দেখ।'

কিন্তু শান্তি কি আছে! গামলার মতো একটা আকাশী ভেলায় এক জোড়া যুবক যুবতী এসে বলা কওয়া নেই টপাটপ নেমে কারপেটে বসে শূন্যে পা দোলাতে দোলাতে গল্প করতে লাগল। বুদ্ধবাবু কিছুক্ষণ বাদে শুনলেন মেয়েটা বলছে, ধ্যেৎ এখানে ভাল নয়। চারদিকে অনেক লোক। তারচেয়ে চলো চাঁদে বেড়িয়ে আসি।

ওরা চলে গেলে বুদ্ধবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

ছোকরাটা কারপেটের ওপরে সিগারেটের ছাই ফেলে গেছে। বুদ্ধবাবু ধুতির কোঁচাটা দিয়ে জায়গাটা ঝেড়ে যেই সোজা দাঁড়িয়েছেন অমনি অমায়িক চেহারার তিলক-ফোঁটা কাটা একটা লোক একটা স্কাই-বাস থেকে ঝুপ করে নেমে পড়ল কারপেটে, বিনয়ের অবতার। হাতজোড় করে বিগলিত হেসে বলল, আজ্ঞে আপনিই তো বুদ্ধবাবু?

হ্যাঁ, আপনি কে?

আজ্ঞে আমি তিলক ভট্টাচার্য। জ্যোতিষী।

বটে!

স্কাই বাস থেকেই দেখলুম আপনাকে। হঠাৎ মনে হল আপনার নেপচুনটা বক্রী। প্লুটোর ওপর শনির নজর।

বলেন কি?

দিন হাতটা এগিয়ে দিন তো। করেখাটা দেখে অনুমান আর প্রত্যক্ষের বিবাদ-ভঞ্জন করি। বলে হাতটা টেনে নিয়ে একটা আতস যন্ত্র দিয়ে ভাল করে দেখে টেখে বলে, যা ধরেছিলুম।

বুদ্ধবাবু সাগ্রহে বললেন, কী দেখলেন?

প্রতিষ্ঠায় একটু বিলম্ব। ধনভাব ভাল। তবে শত্রুবৃদ্ধি-যোগ প্রবল।

বুদ্ধবাবু মিইয়ে গিয়ে বলেন, তা ব্যবস্থা টেবস্থা?

আছে। একটা সিনথেটিক পরশমণি টাংষ্টেনে বাঁধিয়ে পরতে হবে। বাইশ হাজার টাকা পড়বে। দেবোখন। ও নিয়ে ভাবতে হবে না। মিনি ক্যামেরায় হাতের ফটো তুলে নিয়েছি। বাড়ি গিয়ে আরো বিচার করব। আসি আজ্ঞে।

একটা স্কাই-বাস কারপেট ঘেঁষেই যাচ্ছিল, তিলক হাত তুলে চেঁচাল, রোখকে! রোখকে!

বাস থামল, একটা পাটাতন এগিয়ে এল। তিলক গিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

বুদ্ধবাবু কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর নেপচুন যে বক্রী এটা তিনি জানেন। তবে প্লুটোর ওপর শনির নজরটা নতুন কথা। ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে ভাবতে বুদ্ধবাবু পায়চারী করতে লাগলেন।

হঠাৎ ভট ভট শব্দ। বিশাল এক ডানাওলা অ্যাসট্রো মোটরবাইকে এক সার্জেন্ট এসে ঢেঁকিটার পাশে ব্রেক কষে ধমকে উঠে বলল, এই ঢেঁকিটা কার? আপনার?

বুদ্ধবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এটা কি ঢেঁকি পার্ক করার জায়গা? দেখতে পাচ্ছেন না চোখের সামনে সাইন-বেলুনে লেখা রয়েছে নো পারকিং? এটা ইণ্টার-স্পেস সড়ক তা মশাইয়ের জানা নেই?

আজ্ঞে জানা ছিল না।

কাল লালবাজারে যাবেন। ফাইন দিতে হবে।

ইয়ে কি বলে একটা বন্দোবস্ত করলে হয় না? মানে পান খাওয়ার জন্য কিছু দিচ্ছি। বলে বুদ্ধবাবু পকেটে হাত দিয়ে যা বেরোলো তাই সারজেণ্টটার হাতে গুঁজে দিলেন।

সারজেণ্ট গম্ভীর হয়ে বলে, ঠিক আছে। গাড়ির সারিতে পার্ক করুন। এখান দিয়ে এখনই মারস-আর্থ একসপ্রেস রকেট যাবে।

সারজেণ্ট চলে গেলে বুদ্ধবাবু মনে মনে মা কালীকে প্রণাম ঠুকে কারপেট গুটিয়ে পৃথিবীতেই রওনা দিলেন।

●

জানো কি'র উত্তর

১। (ক) ২। (গ) ৩। (খ) ৪। (ক) ৫। (গ) ৬। (গ) ৭। (ক) ৮। (গ) ৯। (ক)

ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিশাপ পৃথিবীর ওপর নেমে এসেছে। চারিদিকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ। কারুর পা উড়ে গেছে বোমার আঘাতে। কারুর হাত উড়ে যাচ্ছে, কারুর বা পাঁজরা খসে পড়ছে। অনেকে হাসপাতালে আসার আগেই স্ট্রেচারের ওপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

ডাক্তার ল্যাণ্ডষ্টিনার ক্ষিপ্রহাতে রোগীদের চিকিৎসা করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে নার্স এলিজাবেথ যন্ত্রের মত সাহায্য করে চলেছে।

—রক্ত চাই এলিজাবেথ, রক্ত চাই—ল্যাণ্ডষ্টিনার চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন—ওই সব আহত সৈনিকদের শরীরে যদি তাজা রক্ত দিতে পারতুম. ওরা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠত।

—রক্ত! এলিজাবেথ আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিল—রক্ত কোথায় পাবেন স্যার?

ল্যাণ্ডষ্টিনার কোন উত্তর দিলেন না। চিন্তিত মনে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। যাবার সময় আদেশ দিয়ে গেলেন, নতুন কোন রোগী এলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে—

নিজের ঘরে ঢুকে বই খুলে বসলেন।

রক্ত নিয়ে আগের ডাক্তারবাবুরা কি গবেষণা করেছেন, তা পড়তে লাগলেন ল্যাণ্ডষ্টিনার।

আগেকার ডাক্তারদের ধারণা ছিল, রক্ত দিয়ে মানুষের চরিত্রের ধারাকে বদলানো যেতে পারে—পাগলের চিকিৎসা করা হত রক্ত দিয়ে। ভেড়ার রক্ত, ঘোড়ার রক্ত, নানারকম জন্তু-জানোয়ারের রক্ত মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত, ফলে রোগী মারা যেত, সেইজন্য সরকার থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল যে রক্ত দিয়ে যেন কোন চিকিৎসা না করা হয়।

বই বন্ধ করে দিলেন ল্যাণ্ডষ্টিনার—

না রক্তের প্রধান প্রধান কাজের কথা কেউ তেমনভাবে ভাবেননি। ল্যাণ্ডষ্টিনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেছেন রক্ত শুধু রক্ত নয়। লাল রক্তের মধ্যে জলীয় ভাগ আছে, কঠিন ভাগ আছে। জলীয় ভাগকে বলা হয় প্লাজমা। এই প্লাজমার মধ্যে প্রোটিন আছে আর প্রোটিন আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধন করে এ কথা সকলেই জানে। কঠিন পদার্থের মধ্যে আছে লোহিতকণিকা, শ্বেতকণিকা আর প্লেটলেটস। শ্বেতকণিকা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচায়। লোহিত-কণিকার মধ্যে লাল রঙের একটি পদার্থ আছে। এই পদার্থের নাম হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ সীমায় বহন করে নিয়ে যায়। অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শরীরের প্রত্যেকটি কোষ কাজ করে, সেই কাজ অক্সিজেনের সাহায্যে হয়। অক্সিজেন বহন করার একমাত্র উপায় হিমোগ্লোবিন।

হিমোগ্লোবিন!

রক্তের মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন আছে, সেই হিমোগ্লোবিনই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী পদার্থ। শরীরে রক্ত দিলে—তৈরি হিমোগ্লোবিন শরীরে প্রবেশ করবে আর শরীরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে—

ল্যাণ্ডষ্টিনার গবেষণা শুরু করলেন। অবাক হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন পশুপাখির রক্তের হিমোগ্লোবিন আর মানুষের হিমোগ্লোবিন একেবারে আলাদা রকমের। মানুষের রক্ত পশুর রক্তের সঙ্গে মেশালেই সঙ্গে সঙ্গে ছানা কেটে যায়। হিমোগ্লোবিন ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। রক্তের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের সমস্ত রক্ত কেটে যায়। রোগী মারা যায়।

ল্যাণ্ডস্টিনার ভাবলেন ছানা কাটা বাঁচিয়ে যদি রক্ত দেওয়া যায়, তাহলেই রক্তদানের সফলতা আসবে।

ল্যাণ্ডস্টিনার আবার গবেষণায় বসলেন।

মানুষের শরীরে মানুষের রক্ত দিতে হবে। পশুপাখির রক্ত মেশাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রক্ত নষ্ট হয়ে যাবে—

ক্যাম্পের বাইরে মুমূর্ষুর আর্তনাদ।

কাতারে কাতারে আহত সৈনিকদের নিয়ে ট্রাক আসছে।

একটা ছেলের দিকে নজর পড়ল ল্যাণ্ডস্টিনারের। ফরসা ধবধব করছে রঙ। কোঁকড়া কোঁকড়া লাল চুল কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পায়ের খানিকটা উড়ে গেছে বোমার আঘাতে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে ফরসা মুখখানি।

পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল এলিজাবেথ ছেলেটির ওপর। আকুল হয়ে ডাকতে লাগল টম—টম—

ক্ষিপ্রগতিতে ল্যাণ্ডস্টিনার ক্ষতস্থান চেপে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কে?

—আমার ছোট ভাই। কাঁদতে কাঁদতে এলিজাবেথ বলল—ও কি বাঁচবে ডাক্তার?

—বলা মুশকিল। যে পরিমাণ রক্তক্ষয় হয়েছে, কিছু রক্ত না দিলে বাঁচানো সম্ভব হবে না মনে হচ্ছে—

এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—আমার রক্ত দিলে হবে না?

—পরীক্ষা না করে কিছু বলতে পারছি না। ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও—

কালবিলম্ব না করে এলিজাবেথ আর ল্যাণ্ডস্টিনার-এর সহকারীরা টমকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। ল্যাণ্ডস্টিনার টমের শিরা থেকে খানিকটা রক্ত টেনে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

ল্যাণ্ডস্টিনার নিজের ঘরে এসে এলিজাবেথকে ডেকে পাঠালেন। এলিজাবেথ আসতে তার শিরা থেকে খানিকটা রক্ত টেনে নিয়ে টমের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

এক মিনিট, দু মিনিট, পাঁচ মিনিট।

ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রাখছেন ল্যাণ্ডস্টিনার আর উত্তেজনায় কাঁপছেন। আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু কই ছানা কাটল না।

তাড়াতাড়ি মাইক্রোস্কোপ বার করে তার নীচে স্লাইডখানি ধরলেন। প্রত্যেকটি লোহিতকণিকা নিখুঁত আছে। একটিও নষ্ট হয়নি। একটিও গলে যায়নি।

ল্যাণ্ডস্টিনার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেই এলিজাবেথকে আদেশ দিলেন তুমি ভাই-এর পাশে শুয়ে পড়।

এলিজাবেথ আদেশ পালন করল। ল্যাণ্ডস্টিনার একটা সরু রবারের নল নিয়ে তার দুপাশে ইনজেকশনের ছুচ লাগিয়ে নিলেন। একটা ছুঁচ এলিজাবেথের শিরায় ঢুকিয়ে দিলেন, অন্য ছুঁচটা ঢুকিয়ে দিলেন টমের শিরায়। এলিজাবেথের রক্ত রবারের নলের ভেতর দিয়ে টমের দেহের মধ্যে চলে গেল।

ক্রমশঃ টমের অবস্থা ভাল হয়ে উঠল।

এলিজাবেথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ল্যাণ্ডস্টিনারকে বলল—ডাক্তার! পৃথিবীর সব সৈনিককে বাঁচাবার জন্যে আমি রক্ত দেব।

ল্যাণ্ডস্টিনার হেসে বললেন—ব্যাপারটা এত সহজ নয়।

—তার মানে?

With compliments from :

ALPLY AGENCIES PRIVATE LTD.

47A, Chittaranjan Avenue.
Calcutta-700012

—পৃথিবীর সব মানুষের রক্ত এক নয়।

—আমায় বুঝিয়ে বলুন ডাক্তার।

ল্যাণ্ডষ্টিনার ধীরকণ্ঠে বললেন—তোমার রক্তের নাম দিয়েছি এক। তোমার রক্ত আর তোমার ভায়ের রক্ত এক গ্রুপের। কিন্তু অন্য কাউকে দিলে ছানা কেটে যাবে আর রোগী মারা যাবে।

—কত রকম গ্রুপের রক্ত আছে?

—চার রকমের। এক দুই তিন চার—পৃথিবীর সমস্ত লোকের এই চার রকমের রক্ত আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি যত বেড়ে চলল, ল্যাণ্ডস্টিনারের গবেষণাও তত পুরোদমে এগিয়ে চলল।

কিছুতেই ল্যাণ্ডস্টিনার শরীরের বাইরে রক্ত সঞ্চিত করে রাখতে পারছেন না। দীর্ঘদিন গবেষণার পর ল্যাণ্ডস্টিনার আবিষ্কার করলেন সেডিয়াম সাইট্রেট আর গ্লুকোজ মিশ্রিত অবস্থায় যদি রক্ত সঞ্চিত করে রাখা হয় তাহলে আর রক্ত জমাট বাঁধে না। শুধু তাই নয়। রক্ত সঞ্চয় করে বোতলগুলিকে রাখতে হবে অত্যন্ত ঠাণ্ডার মধ্যে, যে জায়গার উত্তাপ দু'থেকে চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকবে।

লোহিতকণিকা একুশ দিন বোতলের মধ্যে ঠিক থাকে, সেইজন্যে রক্ত যেদিন টানা হয়, তা থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হয়।

পুরণো দিনের রক্ত গ্রুপকে নতুনভাবে নামকরণ করা হল। পৃথিবীর সব দেশই নতুন নাম মেনে নিলেন—

পুরণো দিনের এক নম্বর গ্রুপের নাম হল এবি—দুইয়ের নাম হল এ, তিন হল বি আর চার হল ও—

তবু সমস্যা রয়ে গেল। নিখুঁতভাবে রক্ত গ্রুপ পরীক্ষা করেও রক্ত দিলে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ঘটে—

আবার গবেষণা—

এবার গবেষণায় পাওয়া গেল—শতকরা পঁচাশি জন মানুষের রক্ত এক রকমের। পনেরো জনের রক্ত অন্য রকমের। শতকরা পঁচাশি জনের রক্তকে বলা হয় রেসাস পজিটিভ—পনেরো জনের রক্তকে বলা হয় রেসাস নেগেটিভ। একই গ্রুপের একজন রেসাস পজিটিভ আর একজন রেসাস নেগেটিভ হলে রক্তে ছানা কেটে যাবে।

এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিশাপের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ।

জানো কি?

১। কার নাম 'সবুজ বালি'?

(ক) গ্লকোনাইট (খ) চালকোসাইট (গ) সিনাবাব

২। কে প্রথম ডি. ডি. টি তৈরী করেন?

(ক) পল মুলার (খ) গেহার্ড ডগমার্ক (গ) জেইডলার।

৩। কোন্ দুটি গ্রহের আবহাওয়া মণ্ডলের উপাদানে খুব বেশী মিল আছে?

(ক) মঙ্গল ও শুক্র (খ) বৃহস্পতি ও শনি (গ) নেপচুন ও প্লুটো।

৪। জন ডালটন রসায়ন ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য কোন্ শাখায় গবেষণা করেছেন?

(ক) আবহাওয়া বিজ্ঞান (খ) সমুদ্র বিজ্ঞান (গ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান।

৫। কোনও জিনিষের স্বাদ টের পেতে কতটা সময় লাগে?

(ক) ২·৫ সেকেণ্ড (খ) ১ সেকেণ্ড (গ) ২৫ মিলি সেকেণ্ড।

৬। কোন্ মাছ সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ডিম ছাড়ে?

(ক) রুই (খ) কাৎলা (গ) মৃগেল।

৭। বর্তমান যুগের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা পৃথিবীতে কত বছর আগে এসেছে?

(ক) ৭ কোটি (খ) ২ কোটি (গ) ২৭ কোটি।

৮। সমুদ্রের অতি ক্ষুদে প্রাণীরা (জুপ্ল্যাঙ্কটন) কোন্ সময় সমুদ্রের ওপর ভেসে ওঠে?

(ক) উষাতে (ঘ) মেঘলা দিনে (গ) গোধূলিতে।

৯। কে সমুদ্রের জলের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে?

(ক) জেলীফিশ (খ) সমুদ্রঘোড়া (গ) সমুদ্র শশা।

উত্তর ২৬১ পাতায়

বঙ্কুবাবুর গল্প

বিমলেন্দু মিত্র

বঙ্কুবাবু পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে গোঁফের কিনারা থেকে কফির দাগটা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বললেন—"বর্ষাকাল! বৃষ্টি নামলেই আমার ভয় করে।"

আমরা অবাক হয়ে ওনার মুখের দিকে চাইলুম। আমার বাড়িতেই আড্ডা। বঙ্কুবাবু, আমার বন্ধু তপেশ, আমার ছোটভাই বিশু আর বিশুর সাতবছরের মেয়ে বুড়ি এই আড্ডায় নিত্য আড্ডাধারী। গিন্নী ভেতর থেকে পাঁপড় ভাজা, কফি ইত্যাদি সাপ্লাই দিচ্ছেন। বাইরের বর্ষনোন্মুখ আষাঢ়ে মেঘ কখনও তাসাপার্টির স্টাইলে, কখনও বা যাত্রাদলের পাখোয়াজ বাজিয়ে, তোড়জোড় করে এতক্ষণে আসরে নামল' রিম্‌ঝিম্ আওয়াজে চারদিক ভরে দিয়ে।

ছোট্ট ভাইঝিটিই জিজ্ঞাসা করল,—"ভয় করে কেন জেঠু? বিষ্টিতে ভয় কি? জল জমে যাবে? তুমি তো সাঁতার জান, সাঁতার কেটে বাড়ি চলে যাবে!"

বঙ্কুবাবু বললেন,—"না রে বুড়ি। জল জমলে এখানেই থাকব। তোর জেঠিমা ইলিশ মাছের পাতুরি রেঁধে খাওয়াবে বলেছিল একদিন। ভয় করে, অন্য একদিনের বৃষ্টির কথা মনে পড়ে বলে, যেদিন বৃষ্টির জন্যে প্রাণ যেতে বসেছিল।"

তপেশ বললে,—"কেন তাল ভাঁজছ বঙ্কুদা, এখনই একটা আষাঢ়ে গল্প শুরু করবে তো? তা করেই ফেল।"

বঙ্কুবাবু বললেন—'আষাঢ়ে গল্প আমি কক্ষনো বলি না। যা বলি তা জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সত্যি অভিজ্ঞতার গল্প। শুনতে ইচ্ছে না করে, বলব না। হ্যাঁরে শিবু, আজ বাজারে ইলিশ মাছ উঠেছিল?"

বিশু শশব্যস্তে বলল,—'দোহাই বঙ্কুদা, গল্পটা বন্ধ করবেন না। তপেশদার হয়ে আমিই মাফ চাইছি। বৌদিকে বলেছি। আর এক রাউণ্ড কফি?'

বুড়িও বায়না ধরল,—'হ্যাঁ, বলনা জেঠু, কিসে তোমার প্রাণ গেল?'

বঙ্কুবাবু হেসে ফেলে বললেন,—'প্রাণ গেল আর কই, তবে আর একটু হলেই যেতে বসেছিল। প্রাণ অবশ্য গেল, প্রফেসার চট্টোরাজের। তোর বাবাদের মাষ্টারমশাই।'

আমি অবাক হয়ে বললুম,—'কোন প্রফেসার চট্টোরাজ? 'বোটানী'র? তিনি তো দশ বছর নিরুদ্দেশ!'

বঙ্কুবাবু বললেন,—'হ্যাঁ, তিনিই। তাঁর নিরুদ্দেশের রহস্য আমিই জানি কারণ আমার চোখের ওপরেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

সেজন্যেই বর্ষাকালে তেমন তেমন বৃষ্টি নামলে এখনও শিউরে উঠি।

'ডাঃ চট্টোরাজ যে খুব নামকরা প্রফেসার ছিলেন তা তোদের মত হোপলেস্ ছাত্ররাও জানে। কিন্তু

তিনি যে আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন তা হয়তো তোরা জানিস না। তিনি গাছপালা খুঁজতে প্রায়ই দেশ-বিদেশে যেতেন। একা একাই পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন।

প্রায় বছর দশেক বললি না? সালটা মনে নেই, সময়টা মনে আছে। সেটা আষাঢ় মাসের শুরু কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি নেই। কলকাতা শহরে ১০৪/৫ ডিগ্রী গরম চলছে। বাসে মাথার ওপরের হ্যাণ্ডেল ধরলে হাতে ফোস্কা পড়ছে। বরফের কিলো দুটাকায় উঠেছে। এমন সময় চট্টোরাজের একটা চিঠি পেলুম। জানতুম উনি কোলকাতায় নেই। তবে কোথায় যে আছেন তা চিঠি পড়েও ঠিক বোঝা গেল না; জায়গাটার নামধাম দেওয়া নেই। বক্তব্যটা খুবই পরিষ্কার। মজঃফরপুরের গাড়ি ধর। রক্সৌল এসে নেপালে ঢোকো। ছোটগাড়িতে এস আমলেক-গঞ্জ। সেখানে লোক থাকবে, নিয়ে আসবে। ব্যস্ আর কিছু নেই।

নেপাল-টেপালে যাইওনি তো আগে। মন্দ কি? বেরিয়ে পড়া গেল।

আমলেকগঞ্জে লোক ছিল। একটা ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে আমায় তুলে দিয়ে পেছনে বসলো। ভৈঁষা, কালীতার, লামীডাণ্ডা হয়ে সিন্ডঞ্জন পাসের কাছে নামিয়ে দিয়ে ট্রাক চলে গেল। ঘন বন, তার পথ ধরলুম। চড়াই আর ওৎরাই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যখন সন্ধ্যা হয় হয়, তখন এসে পৌঁছলুম এমন একটা জায়গায় যেখানে বনজঙ্গল বেশি নেই, চারধারে উঁচু উঁচু পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা সমতলের মধ্যে বেশ সাজানো বাগান, তার একপাশে খোলার চালের মাটির ঘর-বারান্দাওয়ালা, যে বারান্দায় সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শীত শীত কুয়াশার মধ্যে পেঁচার মত মুখ করে বসে রয়েছেন চট্টোরাজ। আমায় দেখে খ্যাঁক-শিয়ালের মত হেসে বললেন—'বঙ্কা এসেছিস? যা মুখ-হাত-পা ধুয়ে খেয়ে নিয়ে টেনে ঘুম দে আজ রাত্তিরে। কাল এমন জিনিষ দেখাবো যা তোর চৌদ্দ পুরুষেও কোনদিন দেখেনি।'

পরদিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে চারপাশ দেখে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। চারদিকে উঁচু উঁচু সবুজ পাহাড়, বিরাট বিরাট গাছে ঘেরা। চট্টোরাজ হুঁ হুঁ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বললেন,—'বঙ্কা, মাইলখানেক হাঁটতে পারবি?' বললুম, 'পেট ভরা থাকলে আর হাঁটতে কি?'

শুকনো মুরগীর মাংস আর পান্তাভাত খেয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। আমার গতকালের গাইড বুদ্ধুচাঁদ রান্নাবান্নার জন্যে বাড়িতেই রইল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নেমে উঠে এঁকে বেঁকে হঠাৎ আবার একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লুম। গোটাকতক ফুটবল মাঠের সমান প্লেন ফাঁকা জমি—কিন্তু ফাঁকা তো নয়, মাঝখানে ওটা কি? দোতলা বাড়ির সমান উঁচু, একটা বিশাল গোল চকচকে রূপোর ক্ষীরমোহন যেন রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ করছে। কি বল্লি বুড়ি? ক্ষীরমোহন খাবি? তোর বাবা এনে দেবে 'খন। যাইহোক, সেই মাঠজোড়া রূপোলী ক্ষীরমোহনটা কেৎরে পড়ে আছে, একটা কোণা যেন রাক্ষুসে কামড়ে ভেঙ্গে গেছে,—ফাঁপা ভেতরটা দেখা যাচ্ছে।

চট্টোরাজ বললেন,—'দেখছিস কি বঙ্কা, এ হল আসল ফ্লাইং সসার, উড়ন্ত চাকতি, ভেঙ্গে পড়েছে এখানে।'

আমি দুবার ঢোক গিলে বললুম,—'মানে, মার্স থেকে এসেছে?'

—বলা যায় না। মার্স হতে পারে, অন্য গ্রহ হতে পারে, অন্য গ্যালাক্সি হতেই বা ক্ষতি কি?

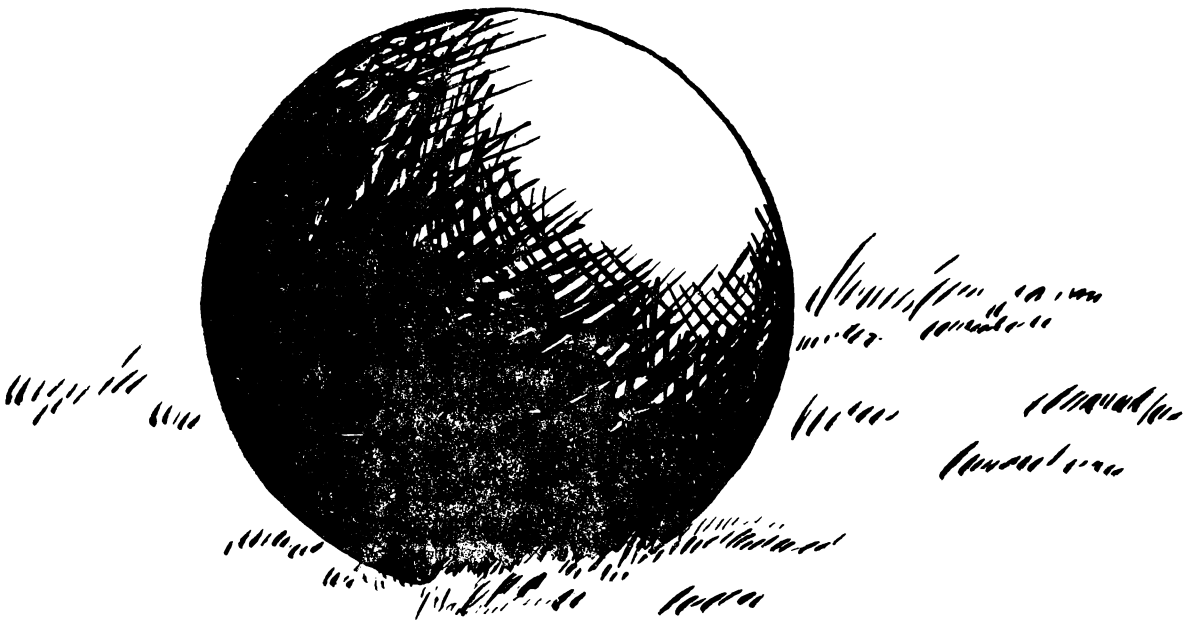

একটা বিশাল গোল চকচকে রূপোর ক্ষীরমোহন যেন রোদ্দুরে ঝকঝক করছে।···

সত্যি সেরকম জিনিষ আমার চৌদ্দ পুরুষে দেখেনি। ওটার প্রকাণ্ড চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ ভয় হল।

চট্টোরাজের খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি শুনে সম্বিত ফিরে পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললুম,—ভেতরে কি অন্যগ্রহের বাসিন্দারা ছিল?'

চট্টোরাজ বললেন,—'কিস্যু না। ভেতরে ঢুকে দেখেছি, শুধুই কলকব্জা, বাসিন্দে কেউ নেই। ভাঙ্গা জায়গাটার মুখে মাটিতে যা সব ছড়িয়ে রয়েছে তা এগিয়ে ছাখ!'

মাটির ওপরে চারপাশে লালরঙের কদম ফুলের মত কাঁটাওয়ালা গোল গোল বলের মত জিনিষ অনেকগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। ওগুলো কি?

চট্টোরাজ বললেন,—'আমার বিদ্যেতে বলে, ওগুলো হল কোন নতুন জাতের উদ্ভিদের স্পোর—এর ফাইলাম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস—কিছুই জানা নেই।'

জিজ্ঞেস করলুম,—'স্পোর আবার কি?'

চট্টোরাজ বললেন,—'অনেক ক্ষেত্রে নিচুস্তরের উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধির জন্যে নিজে নিজেই এককোষী ভ্রূণ তৈরি করে ছড়িয়ে দেয়। ওরাই বেড়ে উঠে আস্ত উদ্ভিদের চেহারা নেয়।'

কি বললি, সে স্পোর তো মাইক্রোসকোপিক? হ্যাঁ, কিন্তু এরা উড়ন্ত চাকীতে করে এসেছে, এরা রাক্ষুসে। বঙ্কা, ওদের কতকগুলো নিয়ে তুই কোলকাতায় ফিরে যা, তাড়াতাড়ি ষ্টেট করিয়ে নিয়ে আয়।'

কিন্তু তার আর সময় পাওয়া গেল না। মাথার ওপরে খুব কড়াকড়, ধুড়ুম ধাড়াম শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখি ঘন মেঘ করেছে, মিশকালো, ধোঁয়ায় গড়া বাসুকীর ফণার মত আকাশে দুলে দুলে ফুঁসে ফুঁসে বেড়ে উঠছে তারা। দেখতে না দেখতে চড়চড়

করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বড় বড় ফোঁটা। যেন মনে হতে লাগলো, অসংখ্য সৈন্যসামন্ত তাদের লম্বা লম্বা বল্লম দিয়ে আমাদের বিঁধতে চেষ্টা করছে আকাশ থেকে। বিভ্রান্ত হয়ে আশ্রয়ের আশায় এদিক ওদিক চাইতেই হঠাৎ বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে লাফিয়ে উঠলো। এ কি? আমাদের আসে-পাশে লাল লাল লম্বা বেলুনের মত, মাটি থেকে ফুলে ফেঁপে উঠছে, ওগুলো কি? সাংঘাতিক! সেই লাল কদমফুলগুলো বৃষ্টির জল পেয়ে চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে। স্পঞ্জের মত বৃষ্টির জল শুষে নিয়ে তেড়ে বেঁকে দুগুণ চারগুণ—একশো দুশো লক্ষগুণ বড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তুত কাঁটাওয়ালা চেহারা নিয়ে। লাল, ক্যাকটাসের মত কোনটা, কোনটা তিন চারটে দৈত্যাকার চ্যাপটা পাতা বা জোড়া জোড়া বলের মত। চট্টোরাজ চোখ বড় করে কানের কাছে মন্ত্রপড়ার মত বলে যেতে লাগলেন—'ওটা বিবলিস আরে, ওটা নেপেনথিস, ওরে বাবা, ওটা বিশাল ডার্লিংটনিয়া, আরে, এটা হিলিয়ামফোরা—ওরে বঙ্কা, ওরা সব মাংসাশী গাছ! আরে, আরে, ওদের যে শেকড় নেই! কি সর্বনাশ, ওরা চলে বেড়াচ্ছে!' আর কিছু শোনা হল না। চোখের সামনে দেখলুম, মানুষের চেয়েও লম্বা একটা অদ্ভুত জ্যান্ত গাছের কাঁটাওয়ালা শক্তপাতা লম্বালম্বি হাঁ করে চট্টোরাজ-কে কপাৎ করে গিলে ফেললে। জলহস্তীর ডাকের মত তাঁর আর্তনাদ ঝপাং করে বন্ধ হয়ে গেল। আর একটা গাছের মস্ত রোঁয়াওয়ালা হাতীর শুঁড়ের মত ডাল আমাকে জড়িয়ে ধরলো বলে! হ্যাঁ, এই হল চট্টোরাজের নিরুদ্দেশ কাহিনী।' বঙ্কুবাবু চুপ করলেন। তপেশ, আমি, বিশু আর্তনাদ করে উঠলুম,—'একি, একি, তারপর? বঙ্কুবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—'তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চারদিক ঝল্‌সে বাজ পড়লো। চোখ বন্ধ করে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলুম। যখন সম্বিৎ ফিরলো, দেখি বৃষ্টি পড়ছেই। আর চারদিক ফাঁকা। সেই সাংঘাতিক গাছেরাও নেই, আর সেই মাঠজোড়া চকচকে ক্ষীর-মোহনও অদৃশ্য। বুড়ি, তোর জেঠীমাকে খিচুড়ি চাপাতে বল। বৃষ্টি না থামলে, আমি বাবা বাইরে যাচ্ছি না!'

জীবাণুসার

● অ্যাজোটোবেকটার ●

জমির উর্বরতা ও ফলন বাড়ায়, গাছ দ্রুত বাড়ে, ঝাঁকড়া হয় ও সতেজ থাকে, ফুল ও ফলের আকার বড় হয়, দানা পুষ্ট হয়, গাছের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ছত্রাক-রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়, জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

● রাইজোবিয়াম ●

বাদাম, সয়াবীন ও সমস্ত ডালচাষে 'রাইজোবিয়াম' জীবাণুসার ব্যবহার করুন। রাইজোবিয়াম ফলন বাড়ায় এবং পরবর্ত্তী ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন জমিতে সঞ্চিত রাখে।

প্রস্তুতকারক :-**নাইট্রোফিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ**

(ভারত সরকার অনুমোদিত)

ব্লক ডি, জয়শ্রী পার্ক কলিকাতা-৭০০০৩৪

ফোন : ৭৭-৩৩২৬, ৭৭-১৪৯০

প্রাগৈতিহাসিক মাছ

সুশীল ঘোষ

দক্ষিণ আফ্রিকার একখানি মেছো জাহাজ, মাছ ধরতে ধরতে গিয়ে পড়েছিল, ঈস্ট লণ্ডনের পশ্চিম উপকূলে।

জালে উঠে এলো বিচিত্র একটি জলজ প্রাণী। একটি মাছ। মাছটি দেখে সকলেই হাঁ হয়ে গেলেন। সকলেই অবাক হলেন—৭১৫ রকম মহাজাতি এবং ৪৭১৭ রকম প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে, পরিচয় আছে তাঁদের। সমুদ্রে এমন কোন গভীরতা বা স্তর নেই যেখানে জীবন নেই। সব জাতি, প্রজাতি, মহাজাতির মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণীর হিসেব আছে তাঁদের তালিকায়। কিন্তু এটি কোন প্রজাতির?

ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগর উপকূল, মোনাকোতে আছে, সমুদ্র-তত্ত্বের জাদুঘর। ওশ্যানোগ্রাফিক মিউজিয়াম। সেখানকার পণ্ডিতেরা রায় দিলেন—এটি হলো 'সীলাকান্থ' (Coelacanth)।

প্রাগৈতিহাসিক মাছ

সুশীল ঘোষ

ওজনে ৫৭ কিলো, দৈর্ঘ্যে মাত্র দেড় মিটার। ডাইনোসর দেখলে লোকে যেমন চমকে উঠবে, এ-ও তাই। মীন তাত্ত্বিকদের জানা ছিল, ছ' কোটি বছর আগে সীলাকান্থ লোপ পেয়েছে। বিস্মৃতির অতলে, দীর্ঘ ছ কোটি বছর—লোক লোচন থেকে নিজের অস্তিত্ব, হাত-আড়াল করে, সীলাকান্থ টিঁকে ছিলো কী করে?

এটা ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালের ঘটনা।

এই ভারত মহাসাগরে, মাডাগাস্কার দ্বীপের কাছে, পরে অবশ্য আরো সীলাকান্থ ধরা পড়েছে।

প্রথমটিকে তোলা হলো ২৩৫ ফুট তলা থেকে। জলের ওপরতলায় রাখা হলেও মাছটি কয়েক ঘণ্টার বেশি বাঁচে নি। মাছটির আঁশ বেশ বড়ো। আকারে গোল চাকতির মতো। রং ঘন নীল। পাখনাগুলি শরীর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটি বোঁটা দিয়ে যুক্ত। লম্বালম্বি চেরা আধখানা বটপাতার মতো অনেকটা। তাদের ডানার গঠন দেখলেই বোঝা যায়—বিস্মৃতপ্রায় ডিভোনিয়ান যুগের শরীর গঠনের সঙ্গে, এখনকার মাছের শরীরের একটা জোড়া তালি। সাড়ে চল্লিশ কোটি থেকে সাড়ে চৌত্রিশ কোটি বছর আগে ডিভোনিয়ান যুগ। তখন আবহাওয়া ছিল অবিরত পরিবর্তনশীল। মাছের আবির্ভাব হলো।

এরপর আবির্ভাব হলো উভচর প্রাণীর। বিবর্তনের পথে এলো কীটপতঙ্গ। ডিভোনিয়ানের পর বহুযুগ উত্তীর্ণ হয়েছে। কারবনিফেরাস সাড়ে ৩৪ কোটি থেকে ২৮ কোটি বছর আগে। এই করে করে ট্রিয়াসিক, জুরাসিক, ক্রিটোসিয়াস, টারশিয়ারি, প্লীস্টোসীন যুগ পার হয়ে এসেছি আমরা। মাছের বর্তমান যে চেহারা, সেটা প্লীস্টোসীন যুগেও ছিল না। প্লীস্টোসীন যুগে বহু স্তন্যপায়ী অবলুপ্ত হলো, জন্ম হলো

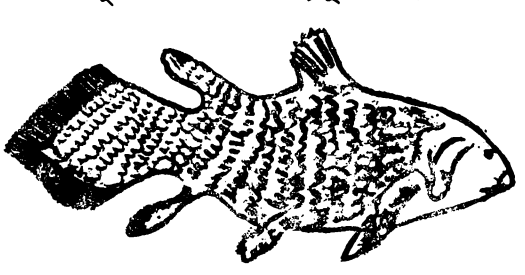

মানুষের। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ক্রিটোসিয়াস যুগের এই মাছ—সীলাকান্থ। এক কথায় ক্রিটোসিয়াস যুগে, অর্থাৎ সাড়ে ১৩ কোটি থেকে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগের এই যুগে, এক মহাপ্রলয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলো ভূ-পৃষ্ঠ। তখনই স্থলচর ডাইনোসর অবলুপ্ত হলো। জন্ম নিলো অতিকায় অতিকায় সব জলচর। এবং বেশ কিছু উভচর।

সেই আমলের উভচরদের মাথার খুলির সঙ্গে সীলাকান্থ-এর খুলির মিল আছে। একটি ৩৬ কেজি ওজনের সীলাকান্থ-এর মস্তিষ্কের ওজন মাত্র আড়াই গ্রাম। শরীরের ওজনের মাত্র ১৫ হাজার ভাগের এক ভাগ।

সীলাকান্থ-এর দৈহিক গঠনে, একই সঙ্গে মেরুদণ্ডী প্রাণীর ও বর্তমান কালের মাছের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সীলাকান্থ-এর আদিপুরুষ মিষ্টিজলের এবং অগভীর জলের বাসিন্দা। ডিভোনিয়ান যুগে তারা মিষ্টি জল এবং

নোনা জল বা সমুদ্রজলে বাস করতে লাগলো। কারবনিফেরাস ও পারমিয়ান যুগে মিষ্টি জলে কতক এবং কতক, জলায় বাসিন্দা হলো। ট্রিয়াসিক-২৩ কোটি থেকে ১৮ কোটি ১০ লক্ষ বছর এবং জুরাসিক ১৮ কোটি ১০ লক্ষ থেকে সাড়ে ১৩ কোটি বছর আগেকার এই দুই যুগে সীলাকান্থ-এর জাত ভাইয়েরা চলে গেল ধরা ছোঁয়ার বাইরে—সীলাকান্থ-রা ডুব মারলো সমুদ্রজলের গভীরে।

সীলাকান্থ প্রথমটি ধরা পড়লো ২৩৫ ফুট গভীর থেকে। পরবর্তীগুলি, লক্ষ্য করার বিষয়, ধরা পড়লো ৪৬৫ ফুট থেকে ১১৫২ ফুটের গভীরতায়। বলা বাহুল্য সাড়ে এগারো'শ ফুটের নিচে থেকে মাছ ধরা যায় না। কিংবা ঠিক করে বললে, ধরা হয় না।

প্রথমটি দক্ষিণ-আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ছোট্ট চালুমনা নদীর মোহনায় ধরা পড়লো, ১৯৩৮ সালে। ২৩৫ ফুট গভীর থেকে।

১৪ বছর পার হয়ে গেল। দ্বিতীয়টি ধরা পড়লো আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ও মালাগাসি-র মধ্যবর্তী ফরাসী কোমোর'স এর একটি দ্বীপ, আনজুয়ানের কাছে। এটিরও কিছুই ছিল না। তোলা হলো এমন বিগলিত অবস্থায় যে তাকে দিয়ে পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ কিছুই সম্ভব হলো না। কোমোরো দ্বীপের লোকেরা এর সুন্দর ঘন নীল রঙের পুরুষ্টু আঁশ দিয়ে সাইকেল টিউবের পাংচার মেরামত করতো।

১৯৭৫ এর শেষ পর্যন্ত ৮০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এদের কাউকেই জ্যান্ত তোলা যায় নি। জ্যান্ত থাকবে কি করে? এরা সমুদ্রের যে গভীরে বাস করে সেখানকার তাপ মাত্রা ১২ ডিগ্রী আর সমুদ্রের উপরতলার তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তাদের বাসস্থানে সমুদ্রজলের চাপ—বর্গ ইঞ্চিতে ২০৫ থেকে ৫০৮ পাউণ্ড আর উপরতলার সমুদ্রজলে চাপই নেই। এই চাপহীন অতি তাপে বাঁচবে কি করে তারা?

কলকাতার ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে, ভারতবর্ষের উপকূলে ধরা পড়া যে নমুনাটি রাখা আছে সেটি লম্বায় ৭০ সেন্টিমিটার। সাড়ে ২৭ ইঞ্চি। এই মাছটির দাঁত নেই। পেটে ছোট ছোট মাছ পাওয়া গেছে আস্ত। অর্থাৎ না-চিবিয়ে গিলে খেয়েছে। ফসিল বা জীবাশ্মদের বলা হয় সীলাকান্থ। জ্যান্তদের বলা হয় ল্যাটিমেরিয়া। এরা খেটে খায় না। অলস প্রকৃতির মাছ। বিচরণ ক্ষেত্রে, মুখের কাছে খাবার পেলে, ভালো! কোমোরো দ্বীপের কাছাকাছি এদের বাস। লম্বায় সাড়ে তিন ফুট থেকে পাঁচ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত মাছ ধরা পড়েছে—৩২ থেকে ৮২ কে জি ওজনের। এদের চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। আলো সহ্য করতে পারে না। চোখে আলো পড়লেই চোখ বুঁজে ফ্যালে। জলের তলার পাথরের খাঁজে ঘাপটি মেরে প'ড়ে থাকে। সাঁতরানোর ক্ষমতা নেই বললেই চলে। শীল মাছের মতো গুঁড়ি মেরে চলে। মেয়ে ল্যাটিমেরিয়ার পেটে ঢাউস সাইজের ডিম পাওয়া গেছে সংখ্যায় পাঁচ, ব্যাসে সাড়ে তিন ইঞ্চি। আর একটির পেটে আবার পাঁচটি শাবক পাওয়া গেল। সীলকান্থের গর্ভাশয়ে প্রথম ডিম উৎপাদন হয়, গর্ভাগারেই স্পেশাল ইনকিউবেটরে তা দিয়ে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা হয়। পৃথিবীর আলো দেখে বাচ্চারা, ডিম নয়।

With the best Compliments of

Premier Investigators India

Private Investigator
&
Security Service

81/2A, Acharya J. C. Bose Road,
Calcutta-700014

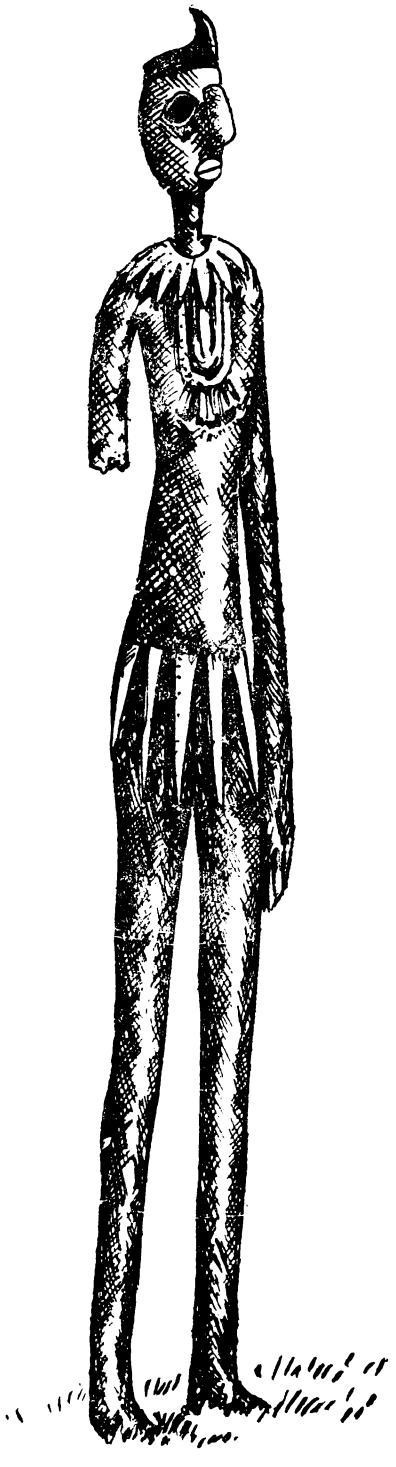

দেবতার চোখে জল

অপূর্বেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সামনে খোলা আকাশ, অসংখ্য অচেনা তারা। এতদূরে এসে পড়ব ভাবিনি। বিকানীরে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী নিয়েছিলাম, ঠিক তিন বছরের শেষে আমাদের দলের প্যাটেল আর, আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। একে বিদেশ তায় শহর থেকে দু'শ পঞ্চাশ মাইল দূরে আফ্রিকার মাসাইদের একটা ছোট গ্রামের বাইরে তাঁবুতে বাস করছি। মাস চারেক আগে আমাদের পঞ্চাশ জনের দল দু'ভাগ হ'য়ে এসে পড়লাম। বাকী পঁচিশ জন জাম্বেসী নদীর উপত্যকায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতেই থেকে গেল।

মাকে চিঠি লিখছিলাম। ফোল্ডিং টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হ্যারিকেনটা প্যাটেল খালি খালি কমিয়ে দিচ্ছিল। গতরাতে এক ধরণের পোকা বড় বিরক্ত করেছে। মাসাইকুলিরা পোকাগুলো ভালো চেনে, একবার গায়ে বসলে ফোস্কা পড়ার মত জল নিয়ে চামড়া ফুলে ওঠে, ঘা হ'য়ে যায়। মুর্শেদদা পোকাগুলোর নাম দিয়েছে 'ব্লিসটার'। কোনরকমে চিঠি লেখা সেরে ফেলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। জুলাই-এর মাঝামাঝি, তাঁবুর পাশ দিয়ে এক চিলতে আকাশে এখানে 'সপ্তর্ষি মণ্ডল' নজরে পড়ছে না। স্কুলে পড়ার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাদে বসে মা আমায় তারা চেনাতেন। আজ আমি কত অসম্ভব দূরে,—এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিলাম।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সামনের একটা মাঝারি পাহাড়ের উপরে উঠে প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরণো একটা ম্যাপ দেখে দেখে নতুন করে জমি জরিপ করি, আমি প্যাটেল আর মুর্শেদদা। আমাদের সঙ্গী পাশের গ্রামের বাইশজন মাসাই কুলি—বিশ্বস্ত, বলিষ্ঠ আর দুঃসাহসী। ভাগ্যিস ওদের দলপতি মবরু একটু-আধটু ইংরাজীতে কথা বলতে পারে, না হ'লে হয়ত কাজ করতেই পারতাম না। এক-

দিনের কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যেবেলা কতক্ষণ এভাবে শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। সম্বিৎ ফিরল মাংস রান্নার তীব্র সুগন্ধে; পাশের তাঁবুতে মাসাই-কুলিরা আজকের শিকারে পাওয়া গোটা বারো বন-তিতির সামনের বাওবাব গাছের নীচে ঝলসে নিয়ে রান্না শুরু করেছে।

চক্রাকারে সাজানো পাশাপাশি আটটা তাঁবু, মজবুত, ঝড়-বৃষ্টি-রোদ সহ্য করে টান্‌টান্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মনটা উদাস হলে নতুন উদ্যমে আবার কাজ শুরু করি। প্যাটেল আমার সমবয়েসী, বাড়ী আহমেদাবাদ। মুর্শেদদার বাড়ী বাংলাদেশের ঢাকা, বাবা ছিলেন দুর্ধর্ষ শিকারী, ছেলেও কম যায় না। তাছাড়া মুর্শেদদা বাঘা দৌড়বাজ, ওস্তাদ সাঁতারু। ওঁর কাছে আছে একটা ইটালীয়ান রাইফেল। সময়ে অসময়ে তাই আমাদের বনমুরগী, তিতির, সজারু বা ভাগ্য ভালো থাকলে হরিণও জুটে যায়।

এদিকে বন পাতলা। সীমাহীন প্রান্তরে দীর্ঘ ঘাসের বন, এখানে ওখানে বাওবাব, ইউকা, বাবলা আর গাবজাতীয় গাছ। মাটি ধূসর। কেবল সিন্‌তানা পাহাড়ের সানুদেশ সতেজ সবুজ। নাম না জানা ছোট বড় গাছে ভর্তি। প্রকৃতির বাগানে লাল ইরিথ্রিনা, বেগুনী ইপোমিয়া, শাদা ভেরোনিকা আর নানা রং-এর অকির্ডের মেলা।

গত দু'মাসে আমাদের জরিপের কাজ প্রায় শেষ; কাজ কমে গেলেও আমরা কিন্তু সকলে উদ্বিগ্ন থাকি। কেননা আমরা যা খুঁজছি ঠিক তার হদিশ এখনও তেমন কিছুই পাই নি।

জাম্বেসী নদীর উপত্যকায় ফেলে আসা ক্যাম্প থেকে আমাদের বন্ধুরা মাঝে মাঝে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। ডিনামাইট ফাটানোর শব্দ ভেসে আসে বাতাসে। এইভাবেই দিনগুলো বেশ কাটছিল। সকাল সন্ধ্যায় কত অজানা পাখীর ডাক, আধমাইলটাক দূরে বরফের মত স্বচ্ছ, স্থির জলায় চাঁদের আলোয় ছিটকে আসে তৃষ্ণার্ত হরিণের আসা যাওয়া, চারিদিকের নৈঃশব্দ প্রকৃতি, কেবল মাঝে মাঝে সরকারী জীপের ঘড় ঘড় শব্দ।

একদিন সকালে মুর্শেদদা বললেন, "চল, মাসাইদের গ্রামটা থেকে ঘুরে আসি, বলছে অনেকদিন থেকে।" এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। মুর্শেদদা, প্যাটেল আর আমি মবরুর পিছু নিলাম। পাহাড়ের ঢালটায় কতকগুলো গুহার সামনে বড় বড় গাছের গুঁড়ি লাগিয়ে পাতার ছাউনি দেওয়া *খান ষাটেক বিচিত্র ঘর। গ্রামের বসতির বাইরে* একটা বড় মাঠ—উৎসব, পালা-পার্বণে এক সাথে মিলিত হওয়ার জায়গা। মাঠটার শেষে পাথরের একটা বিরাট মূর্তি। খুব বড় পাথর কেটে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু এই অদ্ভুত-দর্শন মূর্তিটা বানানো হয়েছে। কবে, কে বা কারা এটা বানিয়েছিল তা কারও জানা নেই। চোখ দুটো বড় বড়। ডান হাতটা কনুই-এর নীচে থেকে ভেঙে গেছে। মাথার চুলের কাছে পাহাড়ী ঝরণার সবুজ শ্যাওলা জমে আছে আমি খালি মূর্তিটার চোখের দিকে চাইছিলাম; কী রকম স্থির, স্বচ্ছ আর বাঙ্ময়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে মবরু বলল, "এই তো পরশু এই দেবতার সামনে তাদের একটা উৎসব হ'য়ে গেল। আমার ছোটছেলেকে সেইদিন থেকে আমরা মাংস খেতে দিচ্ছি।" তারপর মবরু মাঠটার মাঝখানে কাঠের তৈরী একটা ধনুকের মতো খুঁটির দিকে আঙ্গুল দেখাল। "ঐখানে একটা বাচ্চা গরু বেঁধে রাখা হয়, পাহাড়ের নীচু ঢাল থেকে আমাদের কোনও একজন তীরন্দাজ গরুটার গলকম্বল লক্ষ্য করে

তীর ছুঁড়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। তারপর একটা বড় নারকোল মালায় গলা থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত সংগ্রহ করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সেই রক্তিম পানীয় উপস্থিত সকলকে খেতে দেওয়া হয়।' মবরুর কথা শেষ হতে না হতেই দুটো লোক আমাদের জন্যে তিনটে বড় বড় নারকোল মালা এনে হাজির করল। তাতে কলাপাতায় জড়ানো খরগোসের মাংস। 'এগুলো শেষ করুন, পরে এতেই আমাদের দেবতার মাথার উপরের ঝরণার জল খাবেন।' বলল মবরু।

আমরা যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বিরাট লাল-সূর্য্যটা ঠিক যেন মাসাইদের গুহার ভেতরে ঢুকে যেতে চাইছে ; পাহাড়ের উপরের কতকগুলো কটন উড গাছের পাতার ঝিলিমিলির মায়া যেন সূর্য্যটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। বিচিত্র দর্শন দেবতার চোখ যেন সব চেয়ে চেয়ে দেখছে।

সেইদিন রাতেই ঘটল সেই রোমহর্ষক ঘটনা। বাইরে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে বসে কফি খাচ্ছি, হঠাৎ পরপর তিনটে বিস্ফোরণ। চারদিকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য গাছপালা, তাঁবু, মাঠ সব ভীষণ দুলে উঠল। মুর্শেদদা চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। মাসাইকুলিরা চীৎকার করে উঠল। গাছ-গাছালি থেকে পাখীরা ডানা ঝটপট শুরু করল। সামলে নিয়ে প্যাটেল বলল, 'একসঙ্গে ওরা তিনটে ডিনামাইট চার্জ করেছে!'

পরের দিন সকালে যথারীতি ব্রেকফাস্ট সেরে নিরে কাজে বেরোব, মবরু ছুটতে ছুটতে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলতে থাকল, 'আমাদের গ্রামের কেউই আজ থেকে কাজ করতে যাবে না, আপনারা অন্য কোনও দল নিয়ে আসুন। মুর্শেদদা এগিয়ে এসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন। মবরু কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমাদের দেবতা কাঁদছেন, গ্রামে নিশ্চয়ই অশুভ কিছু ঘটবে। কোনও দিন এরকম দেখিনি আমরা।' মবরুর চোখের দিকে চাইলাম। তার দুচোখেও জল ছাপিয়ে উঠছে। জামা, জুতো, বেল্ট, হ্যাভার-স্যাক্ পরণেই ছিল। প্যাটেল বলল, 'কাজ থাক, চল মবরু।' তারপর কি মনে করে মবরুকে বলল, 'মুর্শেদদা আর আমি জাম্বেসী নদীর প্রথম ক্যাম্পটায় যাচ্ছি, পথে তুমি আর সুজয় তোমাদের গ্রামে নেমে যাবে।'

জীপটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারপর সেই বিরাট দর্শন মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে আমিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তার দু' চোখে জল চিক্ চিক্ করছে, সকালে সূর্য্যের আলোয় সেই জলের ধারা রং পাল্টাতে পাল্টাতে ভাঙ্গা ডান হাত বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে নীচে। আমি মবরুর মাথায় হাত দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। তারপর পিছন থেকে খাড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে একটা বুনো জঙ্গল পেরিয়ে একেবারে হাজির হলাম দেবতার প্রায় মাথার কাছাকাছি। ঝরণার জলে চারিদিক পিছল হ'য়ে গেছে। সাবধানে এবার দেবতার চোখে সরাসরি হাত দিলাম, কনুই পর্য্যন্ত আমার দু'হাত ভিজে গেল। আমি দ্রুত দেবতার মাথার কাছ থেকে নেমে পড়লাম। মবরুকে চীৎকার করে বলে উঠলাম, 'আমার সঙ্গে এসো।' এবার আমি ছুটতে শুরু করলাম, রুক্ষ পাথরের গায়ে বৃটিশ বুট জুতোর ঠক ঠক শব্দ দ্রুত তালে বাজতে লাগল। শুধু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, মবরুও কিছু না বুঝে আমার পিছু নিয়েছে। তাঁবুতে পৌঁছে দেখি মুর্শেদদা আর প্যাটেল ফিরে এসেছে। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, 'আমাদের অগের ক্যাম্পের সব লোকজনদের কাল বিকালে

এখানে নিয়ে আসুন মুর্শেদদা, হেড অফিসে একটা খবর দিন।' আমি হাল্কা হলুদ রং-এ ভেজা হাত দু'খানা প্যাটেল ও মুর্শেদদার নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে ধরলাম। মুর্শেদদা প্যাটেলকে নিয়ে আবার জীপ বের করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

পরের দিন বিকালের মুখে তাঁবুর সামনে বাওবাব গাছের নীচে আমাদের ভূ-তাত্ত্বিক সংস্থার ডিরেকটার মাইকেল ম্যাণ্ডাবেলের সামনে প্রায় দেড়শ লোকের জটলা। জাম্বেসী নদী উপত্যকার পুরো ক্যাম্পটাই প্রায় উঠে এসেছে। গ্রামের মাসাইকুলিরা বিপুল আগ্রহে বসে আছে। সবাই প্রায় জোর করে আমাকে কিছু বলার জন্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি থেমে থেমে কোনো রকমে সব্বাইকে বললাম মবরুর কথা, দেবতার কান্নার কথা, উত্তেজনায় আমার ছুটে আসার কথা। এবার উঠলেন আমাদের ডিরেকটার, ক্রিশ্চিয়ান নিগ্রো, বয়সে তরুণ, তিনি জায়গাটা দেখে এসেছেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'এতদিনে আমাদের চেষ্টা বোধহয় সফল হতে চলেছে। জাম্বেসী নদীর কাছাকাছি ক্যাম্পটা থেকে প্রচণ্ড জোরে ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথরের শরীরে ভূ-কম্পন সৃষ্টি করা হয়েছিল গত পরশু তা আপনাদের অনেকেরই জানা। আপনারা জানেন এই কম্পন প্রবাহের তাপমাত্রা ভূ-গর্ভের নীচে সমস্ত অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে উপরে ফিরে এলে বিভিন্ন জায়গায় রেখে দেওয়া 'জিওফোন' যন্ত্রে তা মেপে ফেলা যায়। আমরা 'জিও ফোন' যন্ত্রে কম্পন প্রবাহের গতিবেগ দেখে এই এলাকার পাথরের বিভিন্ন স্তরের গভীরতা, বেধ ও আকৃতির অনেকটা ধারণা করেছি। ভূ-বিজ্ঞানী সুজয় সেন দেবতার চোখে হাত দিয়ে হালকা হলদে রং-এর যে তরলপদার্থ পেয়েছিলেন সেটা যে খনিজ তেল একথা নিশ্চয়ই আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। অপরিশুদ্ধ এই ঘন তেলের রং হালকা হলুদ থেকে গাঢ় সবুজ বা কালো, সব রঙেরই হতে পারে। এখন দেখতে হবে এই খনিজ তেল 'অ্যান্টিক্লাইন' বা 'V' অক্ষরের মত পাললিক পাথরের স্তরে জমা আছে কিনা।' মাসাই-রা এতসব বুঝছিল না। তাদের দেবতার চোখের জলের কথা ওরা বোধহয় ভুলতে পারছিল না। ডিরেকটার আরও দু'একটা কথা বলে এবার মুর্শেদদাকে ওদের বোঝাবার ভার নিতে বললেন। মুর্শেদদা মবরুকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন, মবরু ওদের ভাষায় অনুবাদ করে গেল। মুর্শেদদা বললেন, ঐ গ্রাম্য দেবতার পাহাড়ের নীচে বহুমূল্য খনিজ তেল রয়েছে—এতদিন তা জানা যায় নি। ডিনামাইট ফাটিয়ে 'সিসমিক বা ভূ-কম্প পদ্ধতি'তে কৃত্রিম উপায়ে যে ভূমিকম্প ঘটান হয় তাতে হঠাৎ ঐ খনিজ তেল ফেটে যাওয়া পাথরের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়তে শুরু করেছে। আর আশ্চর্য্য ভাবে গোটা পাথরটা এমনভাবে চির খেয়েছে, যে সেটা ভেতরে ভেতরে ঠিক চোখ দুটোর নীচে দিয়ে গেছে—কাজেই দেবতার চোখে জল।

মুর্শেদদা ওদের বোঝালেন, 'তেল পাওয়া গেলে এখানে বন পাহাড় কেটে শহর গড়ে উঠবে, তোমাদের সকলের দুঃখ ঘুচে যাবে।'

পাহাড়টার ধার ঘেঁষে 'ড্রিলিং' শুরু হওয়ার আড়াই বছরের মাথায় আমি দেশে ফিরলাম। জাম্বেসী নদীর উপত্যকায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পেট্রলিয়াম তেলের সন্ধান মিলেছে। আজও দেশের বাড়ীতে ছাদে বসে আকাশের তারা দেখলেই মনে পড়ে,—বাওবাব গাছ, ধূসর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ছোট পাহাড়, দেবতার বড় বড় দুটো চোখ, প্যাটেল, মুর্শেদদা, মবরু আর কত কাছের মাসাই কুলিরা!

বরফ, তুষার আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বহুদিন থেকে ঢেকে আছে,এই পৃথিবীর দুই প্রান্তদেশ—উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরু। সারা পৃথিবীতে যখন মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির রথ প্রবল গতিতে এগিয়ে চলছে, তখনও প্রচণ্ড দুর্গমতা আর শীতলতার আড়ালে নিজেদের আলাদা করে রেখেছিল পৃথিবীর এই দুই প্রান্ত। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে উঠলেও, এই মেরুপ্রদেশ তখনও ছিল একান্ত অপরিচিত ও রহস্যময়।

রহস্য ও অপরিচয়ের এই অবগুণ্ঠন উন্মোচনের কাজ শুরু হয়েছিল যদিও আরও দেড়শো বছর আগে, কিন্তু উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুর শুভ্র তুষারের বুকে বিজয়ী মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়েছিল এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে—১৯০৯ এবং ১৯১১ সালে। ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল আমেরিকান অভিযাত্রী রবার্ট এডউইন পিয়ারী প্রথম পৌঁছেছিলেন উত্তরমেরুর সুদূর অঞ্চলে। আর এর দু'বছর পরে ১৯১১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দক্ষিণমেরুতে পৌঁছলেন নরওয়ের অভিযাত্রী বৈজ্ঞানিক এমুণ্ডসন। এর মাত্র একমাস পরে ১৯১২ সালের ১৭ই জানুয়ারী ঐ দক্ষিণমেরুতেই পৌঁছলেন আর একজন ইংরেজ অভিযাত্রী—রবার্ট স্কট।

বিজয়ী হলেও এমুণ্ডসন বা স্কট যেমন দক্ষিণমেরুর প্রথম অভিযানকারী নন, তেমনি এডউইন পিয়ারীও নন উত্তরমেরুর একমাত্র অভিযাত্রী। উত্তরমেরুতে এর আগে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অভিযান চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—ষষ্ঠদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক পর্তুগীজ নাবিক উইলিয়াম ব্যারেনটস, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভিটাস্ ডোনাসেন বেরিং, স্যার জন ফ্রাঙ্কলীন, এলিশা কেণ্ট, অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী স্যার হুবার্ট উইলকিন্স এবং ফ্রেডারিক কুক।

এই ফ্রেডারিক কুক ১৮৯১-৯২ সালে উত্তরমেরু জয়ী পিয়ারীর গ্রীণল্যাণ্ড অভিযানে ডাক্তারী হিসেবে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ১৯০৭ সালে নিজে এক অভিযানে বের হন এবং দাবী জানান যে, পিয়ারী উত্তরমেরুতে পৌঁছিবার এক বছর আগে ১৯০৮ সালের ২১ শে এপ্রিল তিনি সেখানে পৌঁছান। কিন্তু পরে বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণে তাঁর এই দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

দক্ষিণমেরু অভিযানে এমুণ্ডসন ও স্কটের আগের উল্লেখযোগ্য অভিযানকারীরা হলেন—ন্যাথানিয়েল পামার (১৭৭৯-১৮৫২), ফরাসী বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী জুল ডারভিলে (১৭৯০-১৮৪২), মার্কিন নৌ অভিযানের নেতা চার্লস উইলকি (১৭৯৮-১৮৭৭) ও বৃটিশ অভিযাত্রী স্যার জেমস্ ক্লার্ক রস (১৮০০-৬২)। উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু বিজয় এই শতাব্দীর প্রথমে সম্ভবপর হলেও প্রাথমিক ভৌগলিক জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে অবদানের জন্য বিগত শতাব্দীর এই সমস্ত দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের কথা আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে।

এই পৃথিবীর প্রান্তদেশ

অসীম বসু

ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক উভয় দিক থেকেই মেরু-প্রদেশের কয়েকটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পৃথিবীর নিজের অক্ষরেখার হেলান অবস্থার জন্য মেরুপ্রদেশের একটানা ছ' মাস দিন বা ছ' মাস রাত্রির কথা হয়তো অনেকেই শুনেছো। এছাড়া আছে মেরুপ্রদেশের বৈশিষ্টময় 'মেরুজ্যোতি' বা আরোরা (Arora)। মাঝে মাঝে মেরুপ্রদেশের আকাশ এক এক জায়গায় একরকমের বিচ্ছুরিত উজ্জ্বলতায় আলোকিত হয়ে থাকে। এই আলোর রঙও হয় বিভিন্ন রকমের। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত বিভিন্ন বিদ্যুৎবাহী কণা মেরুপ্রদেশের শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে আবহস্তরের আয়নোস্ফিয়ারের কয়েকটি দুর্লভ গ্যাসের অনুকে উত্তেজিত করায় এই বিচ্ছুরণের সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা অনেকটা নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপনের মত। নিয়ন আলোতে কাচের নলভর্তি হিলিয়ম, আর্গন, নিয়ন ইত্যাদি দুর্লভ গ্যাসের

অণুকে উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহে উত্তেজিত করে যে আলোর সৃষ্টি হয়, মেরু প্রদেশে অনেকটা সে রকমই কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক উপায়।

এছাড়া, মাঝে মাঝে মেরুপ্রদেশ এক ধরণের আবছা ধূসর আলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঐ অদ্ভুত আবছা আলোয় বাইরের প্রকৃতি, পরিবেশ, সূর্য, দিগন্তরেখা সমস্তই মূহুর্তের জন্য যেন অবলুপ্ত হয়ে যায়। কোনদিকে কিছুই ভাল করে নজরে আসে না, কোন জিনিসেরই ছায়া পড়ে না কিছু। এরকম অবস্থায় আন্দাজে সামনে এগোনো অসম্ভব ও বিপজ্জনক।

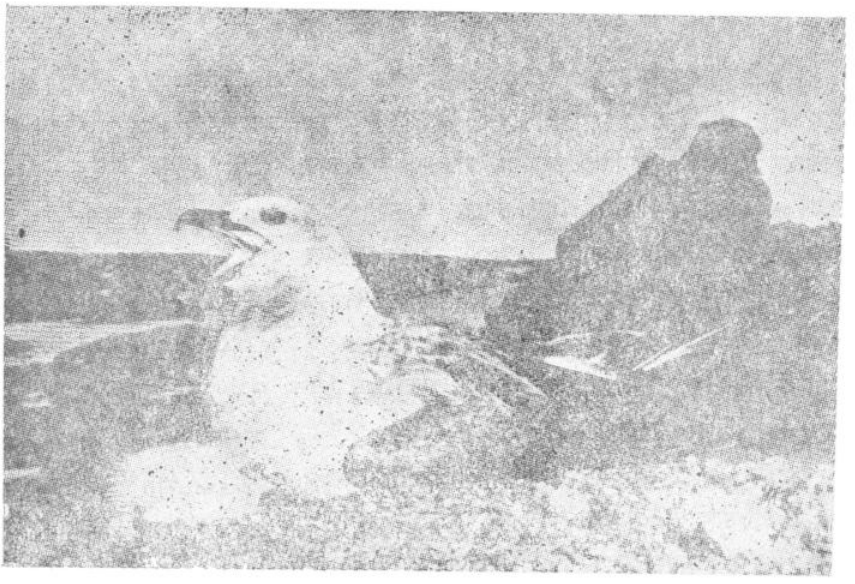

দক্ষিণমেরুর 'স্কুয়া'র প্রধান খাদ্য—পেঙ্গুইনের ডিম আর বাচ্চা।

ভিন্নপ্রকৃতির হলেও মরুভূমির মত এই মেরুপ্রদেশেও মরীচিকা সংক্রান্ত দৃষ্টিবিভ্রম হয়। ঠাণ্ডা বরফের স্তরের ওপরেই ঈষৎ উষ্ণ যে সমস্ত হাওয়ার স্তর থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলোর প্রতিসরণের ফলেই এরকম মনে হয়ে থাকে।

এছাড়া আছে বরফের ওপর সূর্যের অত্যুজ্জ্বল প্রতিফলন। আকাশে সূর্য থাকলে মনে হয় যেন বরফে ঢাকা এই দেশের প্রতি ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা থেকে হাজার হাজার সূর্য তাদের উজ্জ্বল তীব্র আলো প্রতিফলিত করে চলেছে। বিশেষ ধরণের চোখ-ঢাকা রঙীন চশমা ছাড়া খালি চোখে এই তীব্র উজ্জ্বলতার দিকে চাওয়া যায় না কোনমতে।

উত্তর ও দক্ষিণমেরুর মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকেই অনেক পার্থক্য রয়েছে। উত্তরমেরুর সন্নিহিত অঞ্চলটি একটি বিরাট হ্রদের মত—বরফে ঢাকা বিস্তৃত তুষারসমুদ্র ঘিরে রয়েছে ক্যানাডা, গ্রীণল্যাণ্ড, স্ক্যানডিনেভিয়া আর রাশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগ। দক্ষিণমেরু ঠিক এর বিপরীত, জমাট বরফের দেশ ঘিরে রয়েছে তিন সমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের জল।

আগেই বলেছি, শীতকালে দক্ষিণমেরুর তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীরও বহু নীচে নেমে যায়। দক্ষিণমেরুর কয়েকশো কিলোমিটার পূর্বে রাশিয়ার 'বোষ্টক' বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রে একবার—৮৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সাইবেরিয়ার—৬৮°সেন্টিগ্রেড এবং গ্রীণল্যাণ্ডের—৬৬° সেন্টিগ্রেডের ভীষণ শীতলতার থেকেও এই তাপমাত্রা শীতলতর। শীতের সময় তুষার ঝড় হাওয়ার গতিবেগও প্রচণ্ড। দক্ষিণমেরুর কাছেই কেপ ডেনিসনে একবার হাওয়ার গতিবেগ মাপা হয়েছিল ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার।

ভূতত্ত্ববিদদের ধারণায় আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে 'মেসোজয়িক' পর্বে দক্ষিণমেরুপ্রদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা মিলে একটি অখণ্ড ও একক মহাদেশ ছিল, পরে কালক্রমে তা ভেঙ্গে ভূখণ্ডগুলি দূরে সরে বর্তমান ভৌগলিক আকৃতি নিয়েছে। ১৮৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড সুয়েস প্রথম এই ধারণার কথা বলেন। তাঁর সেই মতবাদই সমর্থিত হয়েছে কুমেরু প্রদেশের বরফের নীচ থেকে পাওয়া প্রাচীন উদ্ভিদ

জীবাশ্মের আবিষ্কারে। পুরু বরফের আস্তরণের নীচেই আবিষ্কৃত হয়েছে বহু কোটি বছর আগেকার 'গ্লসোপ্‌টারিশ' (Glossopteris) নামক গুল্ম এবং পাইন ধরণের অন্য আর একরকম গাছের জীবাশ্ম। এই একই ধরণের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে প্রাচীন 'গণ্ডোয়ানা' ভূভাগের সদস্য—এখন বিচ্ছিন্ন, উপরোক্ত ঐ দেশগুলির শিলাস্তরে।

উত্তরমেরুর কয়েকশো মাইল দূরে এর দক্ষিণ সীমানাতে মাঝে মাঝে কিছু গাছপালা এবং লোকবসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। কয়েকটা খনি এবং মাছধরার কেন্দ্রও রয়েছে এখানে। দক্ষিণমেরুর সন্নিহিত অঞ্চল সেদিক থেকে জনপ্রাণী শূন্য। দক্ষিণমেরুর উত্তর সীমানায় কিছু এস্কিমো ছাড়া আসেপাশে কোথাও কোন গাছপালা বা লোকবসতি নেই। উত্তরমেরুর তুলনায় ঠাণ্ডাও এখানে অত্যন্ত বেশী, তার কারণ সম্ভবত এখানকার উচ্চতা। উত্তরমেরুর অধিকাংশ জায়গা যেখানে সমুদ্র সমতল অথবা সমুদ্রসমতলের নীচে—সেখানে দক্ষিণমেরুর গড়পড়তা উচ্চতা ২৪০০ মিটার।

দক্ষিণমেরুর ১৪৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ৫০০ মিটার পুরু বরফের আচ্ছাদন। এই বিপুল পরিমাণ বরফ যদি গলে যায় তবে কি হবে? কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গর্ডন রবিন্ বলেছেন, তাহলে সারা পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রের জল ৭০ মিটার উঁচু হয়ে উঠবে এবং তাহলে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ সমেত পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্রতীরস্থ শহর ডুবে যাবে বেশ কয়েক মিটার জলের তলায় আর পৃথিবীর এই ছোট্ট স্থলভাগের পরিমাণ হয়ে যাবে আরও কম। কুমেরু প্রদেশের বরফ যে গলছে সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ বরফ গলার এই গতি অত্যন্ত ধীর আর এরই সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন তুষার এলাকা।

উত্তরমেরুতে শীতকালে তাপমাত্রা—৫০° সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে যায়, আবার জুন মাসের শেষে যখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হল, তখন তাপমাত্রা মাঝে মাঝে ৭০° ফারেনহাইট্ পর্যন্ত ওঠে। উত্তরমেরুর অনেক বরফ গলে যায় এই সময়ে, আর জুলাই মাসে উত্তরমেরুর অনেক বরফযুক্ত পাহাড়ের গায়ে ফুটে ওঠে নানারকমের ফুলের মেলা। শীতের তুলনায় এখানকার গ্রীষ্ম খুবই ক্ষণস্থায়ী। আগষ্টের শেষেই হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে যায় বহু নীচে। ফুলেরা অদৃশ্য হয় আর উত্তরমেরু জুড়ে নামে শীতকালের তুষার ঝড় আর শীতলতা।

দক্ষিণমেরুর তুলনায় উত্তরমেরুর প্রাণীর সংখ্যা বেশী—কাঠবেড়ালী, মেরু খরগোস, শেয়াল, পেঁচা, বিভিন্ন ধরণের পাখি থেকে আরম্ভ করে মেরুপ্রদেশের নেকড়ে, ক্যারিবু নামের শিঙওয়ালা হরিণ, লোমশ শিঙওয়ালা মোষের মত মাস্ক অক্স, বিভিন্ন আকৃতির তিমি, সীল আর মেরুভল্লুক উত্তরমেরুর প্রাণীজগতকে জমজমাট করে রেখেছে। কিন্তু মেরুপ্রদেশের কথা বললেই যে প্রাণীটির ছবি সবচেয়ে প্রথমে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, সেই পেঙ্গুইনেরা এখানে একান্তভাবেই অনুপস্থিত।

দক্ষিণমেরুতে বিভিন্ন রকমের তিমি আর শীলমাছ ছাড়া রয়েছে, বিভিন্ন জাতের অজস্র পেঙ্গুইন। উত্তরমেরুর তুলনায় প্রাণীর সংখ্যা এখানে অনেক কম হলেও, মেরুপ্রদেশের বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে পেঙ্গুইনরা দক্ষিণমেরুর প্রাণীজগৎকে বৈশিষ্ট্যময় করে রেখেছে।

১৯৫৪ তে এই দক্ষিণমেরু সন্নিহিত অঞ্চলেই হয়েছে একটি চরম বিস্ময়কর আবিষ্কার। আবিষ্কারটি করেছেন জনৈক নরওয়ের বিজ্ঞানী। দক্ষিণমেরুর এই শীতল অংশে 'চয়েনিকটেইড' নামে এমন এক দুর্লভ মাছের নমুনা তিনি সংগ্রহ করেছেন যার রক্তের রঙ সাদা। পৃথিবীতে এই ধরণের রক্ত সমন্বিত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এটিই সম্ভবত একমাত্র উদাহরণ। রক্তের এই অস্বাভাবিক রঙের জন্য প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এই মাছের রক্তে লোহিতকণিকার অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।

দক্ষিণমেরুতে গবেষণার ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক সুন্দর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্তের এই অজানা অংশের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য একই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছেন আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, দক্ষিণ আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা, পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বৈজ্ঞানিক দল।

———

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

এই অদ্ভুত অসুখটা ভবশংকরকে পেয়ে বসেছে অবসর নেবার পর থেকেই। দু'বছর আগেও কিন্তু বেশ ছিলেন। দিব্যি অক্সিজেন-মাস্ক এঁটে কলেজ গিয়েছেন, কাচের ঘরের ভেতর সারি সারি শীর্ণকায় ছেলেমেয়ের সামনে মাইক্রোমিটার ফিল্ম দেখিয়ে পড়িয়েছেন। এমন কথাও শুনেছেন, ইতিহাসের অধ্যাপক ভবশংকর মুখার্জী বাংলাদেশের গর্ব। এখনকার এই জীবন কখনো যে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে সে কথা বোধহয় কখনো মাথাতেই আসেনি তাঁর। অথচ অবসর নেবার পর কি যে হল, সমস্ত পৃথিবীর চেহারা পালটে যেতে লাগল তাঁর চোখের সামনে। এই সারি সারি বায়ুনিরুদ্ধ কাচের ঘর, বাইরের পাঁশুটে আকাশ, বিষাক্ত ধোঁয়াটে আবহাওয়া, পিচ ঢালা রাস্তার পাশে পাশে রুক্ষ গৈরিক প্রান্তর। এক ফোঁটা সবুজ নেই কোথাও—না ঘাস, না লতা, না গাছ। এই কাচের পৃথিবীতে কাজ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু অবসর যে কি ভয়ংকর! সকাল নটা-সাড়ে নটার মধ্যে পুত্র এবং পুত্রবধূ দুজনেই বেরিয়ে যায় কাজে। কাজ ছাড়া নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার অন্য কোন উপায়ও তো নেই। দশ বছরের নাতি রাকেশ স্কুল থেকে ফিরে আসে এগারোটা নাগাদ। এই সময়টুকু ছটফট করেন ভবশংকর—অসুখের পোকাগুলো সারা মাথায় দাপাদাপি করে বেড়ায়। নাতি ফিরে এলে ভবশংকর তাকে নিয়ে পড়েন। তাঁর সবুজের অসুখ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রায়ই এইভাবে চলে কথাবার্তা ঃ

'সেই গল্পটা শুনবে না রাকেশ, সবুজের গল্প?'

রাকেশের পাণ্ডুর মুখ এগিয়ে আসে কাছে, বলে, 'শুনবো দাদু।'

'তখন অনেক সবুজ ছিল রাকেশ, অনেক সবুজ। পৃথিবীময় সবুজ ঘাস, সবুজ গাছপালা—গাছ কি তুমি জানো তো দাদুভাই?'

'হ্যাঁ দাদু, পড়েছি। গাছ মানে উদ্ভিদ, এক ধরনের প্রাণী। মাটিতে বীজ পুঁতলে তারা বেড়ে উঠতো ধীরে ধীরে—'

'ঠিক বলেছো। আমরা যেমন অক্সিজেন নিয়ে নিয়ে বাঁচি, তাদের দরকার হতো কার্বন-ডাইঅক্সাইড—তার বদলে তারা অক্সিজেন ছেড়ে দিত। সেই অক্সিজেন মিশে থাকতো বাতাসে। আজকের মতো এই রকম কাচের ঘরে বাস করতে হতো না রাকেশ, কৃত্রিম বাতাস তৈরী করতে হতো না—মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতো যেখানে খুশী, অক্সিজেন সিলিণ্ডার বয়ে নিয়ে যেতে হতো না। তোমার মত বাচ্চারা আনন্দে খেলে বেড়াতো মাঠে—'

'এসব কবেকার কথা দাদু ? নব্যপ্রস্তর যুগ ?'

'নারে পাগলা, এই কয়েকশো বছর আগেও সব কিছু ছিল।'

রাকেশ তেমনি পাংশু মুখে বলে, 'কেমন করে নষ্ট হলো সব ?'

ভবশংকর থিতিয়ে যান। আজকের দিনে বাচ্চা ছেলেগুলোরও 'আই-কিউ' অনেক বেড়ে গিয়েছে। সবুজ শাকসব্জি আর জৈব প্রোটিনের অভাবে শরীর যতই লাবণ্যহীন হয়ে যাক, মস্তিষ্ক অনেক প্রখর হয়েছে। কিন্তু তবু ভবশংকর ওকে সেসব কথা বলতে পারবেন না। ইতিহাসের পাতায় মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার যে নগ্ন বিবরণ এখন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে সে কথা ওই বাচ্চাকে জানাতে তাঁর লজ্জা করবে। শুধু বললেন, 'এসব একদিনে হয়নি রাকেশ, আস্তে আস্তে সমস্ত পরিবেশ দূষিত হয়ে গেছে। যখন সময় ছিল তখন মানুষ তেমন করে বুঝতে পারেনি, যখন পেরেছে তখন আর কিছু করবার নেই।'

'মানুষ কেন বুঝতে পারেনি দাদু ?'

'তাতো বলতে পারবোনা দাদু ভাই! হয়ত বুঝতে পেরেছে—কিন্তু সেটা আটকাতে গেলে সভ্যতা যে পিছিয়ে পড়তো, রাশি রাশি নতুন কল-কারখানা যে বন্ধ করে দিতে হতো—সে কি কেউ করতে দেয়! যেটুকু বাকি ছিল—মানুষের হিংস্র লোভ সেটুকুও শেষ করে দিল।'

'তুমি কি গত শতাব্দীর পেট্রোলিয়াম যুদ্ধের কথা বলছো দাদু ?'

'হ্যাঁ দাদুভাই। তার আগেও কিছু কিছু সবুজ ছিল—যা অল্পস্বল্প গাছপালা ছিল মানুষ তা বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতো। তখনও এইভাবে আমাদের ভিটামিন পিল আর ল্যাবরেটরীর সিন্থেটিক খাবার খেতে হতো না—প্রত্যেক বাড়িতে রান্না হতো। মাঝে সাঝে র‍্যাশনে যেটুকু সব্জি পাওয়া যেত, সংরক্ষিত খামার থেকে যতটুকু চাল পাওয়া যেত—মায়েরা রান্না করতেন। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া মাছ বা মাংস—সেসব টাটকা জিনিসের স্বাদই নাকি আলাদা ছিল দাদুভাই! এর ওপর একটা ফিল্ম আছে আমার কাছে, তোমায় আমি দেখাতে পারি।'

'কিন্তু কি করে সেসব নষ্ট হল সে তো বললে না দাদু ?'

'সে যে অনেক কথা রাকেশ—তুমি কি সব বুঝতে পারবে ?'

'পারবো দাদু, আমি যে ভূগোল পড়ি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গঠন তো আমি জানি।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ দাদু, বলবো—শুনবে ? পৃথিবীর ঠিক ওপরে আছে ট্রপোস্ফিয়ার—ঝড়বৃষ্টি ওই অঞ্চল থেকেই সৃষ্টি হয়। তারপর আছে ট্রপোপজ—বলতে পারো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার আর ট্রপোস্ফিয়ারের মাঝখানে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলেই থাকে ওজোনের স্তর, যে ওজোন সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ছেঁকে নিয়ে আমাদের বাঁচায়। তার ওপরে আছে স্ট্যাটোপজ —অর্থাৎ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার আর মেসোস্ফিয়ারের মাঝখানের অঞ্চল। সবচেয়ে ওপরে আছে মেসোস্ফিয়ার—'

ভবশংকরের চোখ জ্বালা করে। এতটুকু একটা বাচ্চা ছেলে—সেও বলতে পারে বায়ুমণ্ডলের গভীর রহস্য। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও, এত বছরের সব বাছাইকরা মস্তিষ্ক পৃথিবীর এই চরম দুর্দিন আটকাতে পারল না। ভবশংকরের বুকের ভেতরে এক শির-শিরে যন্ত্রণা তাঁকে পাগল করে দেয়। কত কি যে

'বাবা, এসব পাগলামি আপনি করছেন কেন?'.....

তিনি বলে যান তিনি নিজেই জানেন না। সামনে কেবল একটি পাণ্ডুর কচি মুখ—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অর্থহীন দৃষ্টিতে।

কিন্তু বেশীদিন এভাবে কাটানো গেল না। ব্যাপারটা একদিন ধরা পড়ে গেল রাকেশের বাবার কাছে। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মনীশের মুখ। পরের দিন কাজে বেরুবার আগে ভবশংকরের কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা, এসব পাগলামী আপনি করছেন কেন?'

'কিসের পাগলামী?'

'রাকেশকে আপনি ওসব যা তা কথা শেখাচ্ছেন কেন?'

'যা তা কথা? কই, ওকে তো আমি খারাপ কথা কিছু শেখাইনি। ওকে আমি স্বপ্ন দেখতে শেখাচ্ছি, সবুজের স্বপ্ন।'

'কিন্তু বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির দিনে ওকে আপনি বিজ্ঞানকে ঘৃণা করতে শেখাচ্ছেন—সেটা কি ঠিক?'

'না মনীশ, ঘৃণা করতে আমি শেখাইনি।'

'আপনি বলেছেন পৃথিবীর আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি দেখেও বিজ্ঞানীরা কিছুই করেননি।'

'না, আমি বলেছি তাঁরা তা পারতেন—কিন্তু তেমন করে কোন চেষ্টা তাঁরা করেননি।'

'সেটাই বা বলছেন কি করে? বিজ্ঞান কি করেছে আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না? প্রত্যেকের জন্য বায়ুনিরোধক কাঁচের ঘর, তার মধ্যে কৃত্রিম আবহাওয়া! দূষিত আবহাওয়ায় প্রাকৃতিক খাদ্যের ভাঁড়ার প্রায় শূন্য, কত চেষ্টা করে তার বিকল্প তৈরী করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম যুদ্ধের পর পৃথিবীর জ্বালানী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—তবু উন্নতিশীল কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় নি। এসব কি কিছুই আপনার চোখে পড়ে না?'

'পড়ে মনীশ, পড়ে। কিন্তু এ সবই যে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে বাঁচাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে কতটুকু চেষ্টা করেছে বলো তো? অথচ এই সর্বনাশের সংকেত

কি আগে পাওয়া যায় নি। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে ভারী ধোঁয়ার মত কুয়াশা কি তারা তৈরী হতে দেখেনি?'

'আপনি ফটোকেমিক্যাল স্মগের কথা বলছেন?'

'নিশ্চয়ই? বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই তা মানুষের চোখে পড়েছে! সেই স্মগ পেনসিল-ভ্যানিয়ায় দেখা গিয়েছে, নিউইয়র্কে দেখা গিয়েছে, লণ্ডনে দেখা গিয়েছে। মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে এই স্মগ: তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়েছে। কিন্তু কই, বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে মাথা ঘামালো কই?'

'মাথা ঘামিয়েছিল বাবা। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ধূলিকণা—এ সবের অনুপাত-বৃদ্ধি আবহাওয়াকে কিভাবে পালটে দিতে পারে এ নিয়ে তারা প্রচুর চিন্তা করেছে। গ্রীনহাউস এফেক্ট সম্বন্ধে মাইক্রোফিল্ম তো ছোটবেলায় আপনিই আমাকে দেখিয়েছিলেন!'

'আমি নিজেও তা অনেকবার দেখেছি মনীশ, অনেকবার। বিজ্ঞানীদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড, সেইজন্যে তার প্রতিক্রিয়ার কথাই তারা বেশী করে চিন্তা করেছে। অথচ আসল সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এল যে গ্যাস—সেই সালফার ডাই-অক্সাইডের ব্যাপারে তারা মোটেই সাবধান হলো না।'

'না না, এটাও ঠিক নয় বাবা, সেদিনের বিজ্ঞানীরাও খুব ভাল করেই জানতেন সালফার-ডাই-অক্সাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের মত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে জমতে থাকলে কি হতে পারে। কিন্তু সেইসব গ্যাস বাতাসে থেকে যাবার সম্ভাবনা একে-বারেই ছিল না। দেখুন, মানে এই দূষিত গ্যাস প্রাথমিক ভাবে তো জমা হবে ট্রপোস্ফীয়ারে! তা সেখানে বাতাসের ধূলিকণা আর জলীয় বাষ্পকে আশ্রয় করে তারা সালফারের বিভিন্ন যৌগে, আই মিন, নানারকম সালফেট আর সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হবে সত্যি কথা—কিন্তু বৃষ্টি আর কুয়াশায় তো তা ধুয়ে যাবে! সুতরাং বায়ুমণ্ডলে তা যে জমে যেতে পারবে না সে তো সেদিনই তারা বলেছে।'

'কিন্তু এর অন্যদিক তো তারা তেমন করে চিন্তা করেনি। তার ফল কি হল দেখ মনীশ, সেই অ্যাসিডের বৃষ্টিতে পৃথিবীর মাটি ক্রমাগত উর্বরতা হারাতে থাকলো, ফসল কমে এলো, গাছের পাতা ঝরে পড়লো, সমুদ্রে মাছের বংশবৃদ্ধি একেবারে শেষ হয়ে গেল, তারপর—তারপর—'

'ওঃ, কি বীভৎস সেই পেট্রোলিয়াম যুদ্ধ! আমি ফিল্ম দেখি আর আমার চোখ ফেটে জল আসে মনীশ, বিশ্বাস করো—'

'বাবা! সেন্টিমেন্টাল হয়ে কোন লাভ নেই। পেট্রোলিয়াম যুদ্ধ বিজ্ঞানীদের কাজ নয়।'

'পৃথিবীর মানুষের কাজ! তাদের অপরাধ! তাই তো আমি সবুজের স্বপ্ন দেখি মনীশ—এই কচি বাচ্চাটাকে আমি স্বপ্ন দেখতে শেখাই—যে পৃথিবী অনেক অনেক সবুজ ছিল, সতেজ ছিল—তার স্বপ্ন!'

'কিন্তু তাতে যে ও এখনকার পৃথিবীকে ঘৃণা করতে শিখবে।'

'শিখুক? পৃথিবীকে কি মানুষ ভালবাসার মত করে তৈরী করেছে?'

'তা হয় না বাবা, তা হয়না। তাই এর ব্যবস্থাও আমি করেছি।'

'কিসের ব্যবস্থা?'

'রাকেশকে আজ সকালেই আমি হস্টেলে রেখে দিয়ে এসেছি।'

'মনীশ! আমার দাদুভাইকে তুই কেড়ে নিলি

আমার কাছ থেকে ?'

'না, তা নয়, আপনি তো জানেন, প্রত্যেকটা ঘরে তিনজনের বেশী লোক বাস করবার মত অক্সিজেন ওরা সাপ্লাই করে না। আপনাকে খাতির করে এতদিন দিতো, কিন্তু আপনি রিটায়ার করবার পর থেকেই ওরা একটু ইতস্তত করছিল—'

'অ্যাঁ, একথা আমাকে তুই আগে বলিসনি কেন ?' জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন ভবশংকর—'সর, সর আমি আজই চলে যাবো এখান থেকে। এক্ষুনি !'

'বাবা ! কোথায় যাচ্ছেন ? শুনুন—'

'আমাকে বাধা দিস না।'

'কিন্তু সিলিণ্ডার নিয়ে যান ! ওরকম করে যাচ্ছেন কেন ?'

'কোন দরকার নেই—কয়েকশো বছর আগেকার মানুষ পৃথিবীতে যেভাবে ঘুরে বেড়াতো আমি সেই ভাবেই যাবো।'

'কি পাগলামী করছেন'—মনীশ আটকাবার চেষ্টা করল, 'এভাবে আপনি মিনিট কয়েকের বেশী টিঁকতে পারবেন না, আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে—তাছাড়া এই বাতাসে কত ধরণের, ভয়ংকর ক্যানসারের জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে আপনি তো জানেন ! বাবা—'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলেন ভবশংকর। কাচের দরজা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলেন শিশুর মত। গৈরিক প্রান্তরে অস্বচ্ছ বাতাসে তাঁর দেহটা কয়েক মুহূর্তেই ঝাপসা হয়ে এল।

অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে নিমেষে বাইরে বেরিয়ে এল মনীশ। আন্দাজে ছুটতে লাগলো সামনের মাঠ লক্ষ্য করে। মিনিট দশেক এলোমেলো ছুটবার পর খুঁজে পাওয়া গেল ভবশংকরকে।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন মাটির ওপরে। চোখ দুটো বিস্ফারিত—বিবর্ণ আকাশের দিকে যেন পরম বিস্ময়ে চেয়ে আছে। দু হাতের মুঠো শেষবারের মত আঁকড়ে ধরেছে মাটি। ঠোঁটের কষ বেয়ে নেমে এসেছে রক্ত, কিন্তু মুখে কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই—সমস্ত মুখে চোখে যেন সবুজের স্বপ্ন ঝলমল করছে !

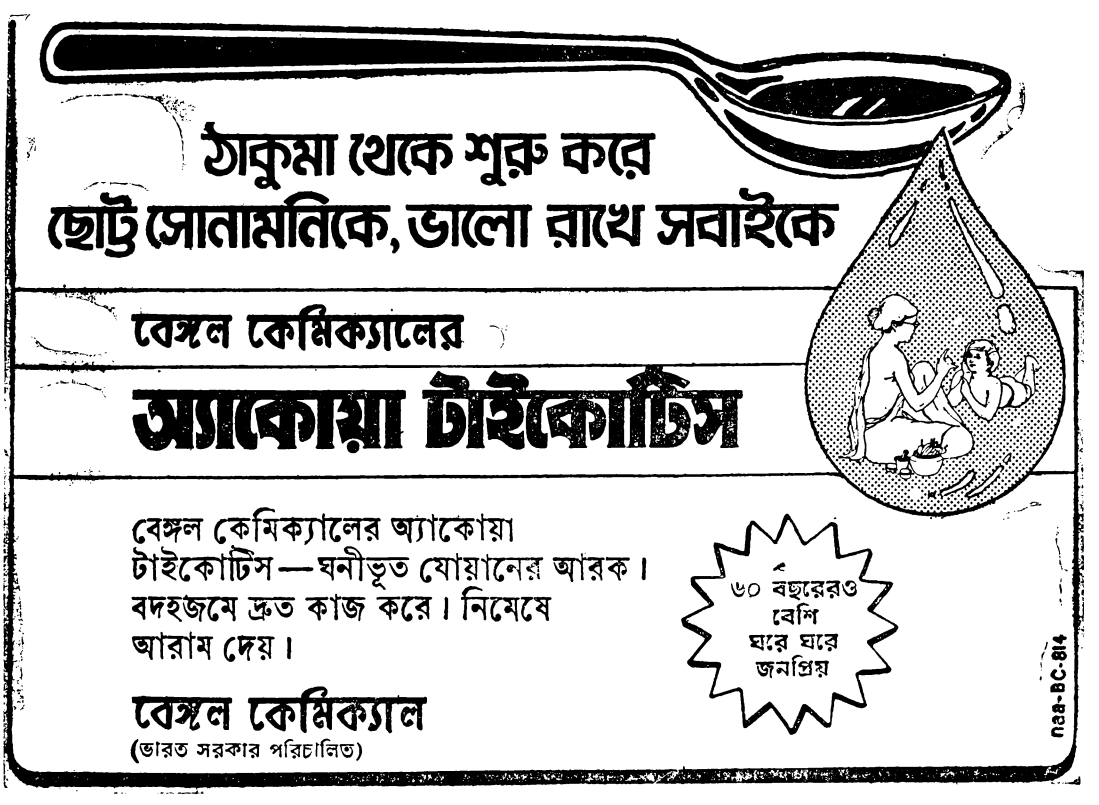

যারা ডুব দেয় সাগরে

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের তলাকার রহস্য জানবার জন্যে যে ডুবুরীরা জলের তলায় গিয়ে অনুসন্ধান চালায় তাদের সাথে আমাদের পরিচয়টা অনেক দিনের। আমরা এদের কাছে যেমন মুক্তার খোঁজ করি তেমনি জলের তলায় কোনো জাহাজ ডুবে গেলে সেই জাহাজের লোকজন উদ্ধার করতেও আমরা এদেরই শরণাপন্ন হয়ে থাকি। কিন্তু জলের তলায় গিয়ে এরা কাজ করে কি করে—এ প্রশ্ন জাগাটা কি খুব স্বাভাবিক নয়?

আমরা অর্থাৎ মানুষরা কিন্তু বাতাস ছাড়া এক মুহূর্তের জন্য বাঁচতে পারি না। আর আমাদের শরীর তো আর মাছেদের মতো নয় যে সাধারণভাবেই আমরা জলের তলায় ঘুরে বেড়াব? তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জলের তলায় ঘুরে বেড়াবার জন্য একটা বিশেষ রকমের পোশাকের আশ্রয় নিতে হয়। এই পোশাকের ভেতরেই এমনসব ব্যবস্থা করা থাকে যাতে ডুবুরীদের জলের তলায় স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনরকম কষ্ট না হয়, সামুদ্রিক জীবজন্তুর হাত থেকে যেন রক্ষা পায় আর সর্বোপরি তারা যেন সক্ষম ভাবে তাদের যাবতীয় কাজগুলোকেও সমাধা করতে পারে। এই সব কারণে বাইরে থেকে এই পোশাক খানিকটা জবরজং রকমের দেখতে হলেও এর প্রতিটি অংশই কিন্তু কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খুব সাধারণভাবে একজন ডুবুরীকে প্রধান পোশাক হিসেবে সঙ্গে রাখতে হয় শিরস্ত্রাণ আর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্বলিত একটি ধাতব বুক-চাদর বা Breastplate যা কিনা বুকের ওপর লাগানো থাকে। সম্পূর্ণ পোশাকটা তৈরী হয় Vulcanised rubber আর নরম পশম দিয়ে। এদের কোমরে বাঁধতে হয় চামড়ার বেল্ট, যদিও এটা মোটেই সাধারণ বেল্ট নয়; কারণ এর সাথে জুড়ে দিতে হয় বেশ খানিকটা সীসা—শুধুমাত্র ওজন বাড়াবার জন্য। এরপর যে জিনিষটা বাকী থাকে তা হলো গিয়ে একজোড়া ভারী জুতা। এই জুতোটাও বিশেষভাবে তৈরী হয়ে থাকে এইজন্যে যে জলের তলায় সাঁতার কাটবার সময় এই জুতো যাতে বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে।

শিরস্ত্রাণ আর বুক-চাদরটি গলার কাছে পারস্পরিক স্ক্রু-প্যাঁচের সাহায্যে আটকান থাকে। এর ভেতরে একটা চামড়ার গ্যাসকেট বা রিং জড়ানো থাকে এইজন্যে যাতে এ দুটো জিনিষের মধ্যে কোনরকম কোন ফাঁক না থাকতে পারে। লখীন্দরকে বাঁচাবার জন্য চাঁদ সদাগর যেমন লোহার বাসরঘর তৈরী করেছিলেন ঠিক তেমন ধাঁচেই যেন তৈরী হয়ে থাকে ডুবুরীদের পোশাক। কারণ ডুবুরী যখন জলের নীচে কাজ করে তখন তার মাথার ওপর যে পরিমাণ জল

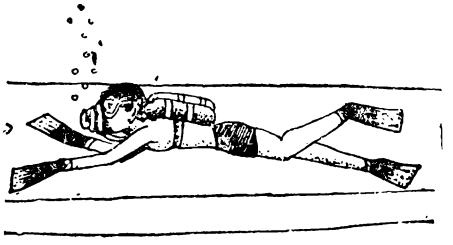

থাকে তার চাপ কিন্তু নেহাৎ কম নয় বরং এত বেশী যে একটু এপাশ ওপাশ হলেই ডুবুরীর মৃত্যু অবধারিত। এই অবস্থায় সামান্যতম ছিদ্রের সুযোগে যদি জল ঢুকবার পথ পেয়ে যায় তাহলে তা সমস্ত সাম্যবস্থাকেই অসাম্যের চূড়ায় তুলে দিতে পারে। আবার সেই প্যাঁচের জন্য শিরস্ত্রাণ না আবার বেশী ঘুরে যায় কিংবা হঠাৎ করে খুলে বেড়িয়ে যায় তার জন্য আর একটি বন্দোবস্ত থাকে—যাকে 'সেফটি লক' বলা হয়ে থাকে।

শিরস্ত্রাণের ভেতর দিকে চারপাশে চারটে জানালা থাকে যাতে করে ডুবুরীদের পক্ষে চারপাশে তাকানো সম্ভব হয়। শিরস্ত্রাণের পেছন দিকে দুটো ফিটিংসের ব্যবস্থা আছে। এর একটিতে পিঠে অক্সিজেন ভর্তি সিলিণ্ডার থেকে বেড়িয়ে আসা পাইপ ঢোকানো থাকে আর অন্যটিতে থাকে লাইফলাইন ও অ্যাম্প্লিফায়ার বা টেলিফোনের তার। অক্সিজেন আগমনী

নলটি যেখানে লাগান থাকে সেখানটিতে একটা একমুখী ভাল্‌ভ লাগানো থাকে যাতে করে কোনক্রমেই ভেতরকার অক্সিজেন বেড়িয়ে আসতে না পারে।

এই একমুখী ভাল্‌ভটির প্রয়োজন দুটি কারণে। একটি হ'ল—ডুবুরীর বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন দরকার সেই অক্সিজেন এই ভালভের মধ্য দিয়ে ভেতরে আসতে পারে, অন্যদিকে বাইরের চাপকে সাম্যবস্থায় নিয়ে আসতেও এই ভাল্‌ভটি ডুবুরীকে সাহায্য করে।

কিন্তু এতো হল গিয়ে শ্বাস গ্রহণের কথা। কিন্তু মানুষ যে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেয় তার জন্যও চাই একটা বহির্গমন নল। শিরস্ত্রাণের ওপর এরকম একটি নল থাকে—সেটিও একমুখী, শুধুমাত্র বাইরে বেরোবার জন্য। এই নল দিয়ে একদিকে যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে আসে তেমনি অন্যদিকে শিরস্ত্রাণের ভেতরকার বায়বীয় চাপও এরদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

অক্সিজেন নলের সাথে আরও একটি বাতাস নিয়ন্ত্রণকারী ভাল্‌ভ থাকে। এই ভাল্‌ভটি ও বহির্গমন ভালভটির সাহায্যে ডুবুরীরা নিজেরাই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কারণ, ভাল্‌ভ দুটিই ডুবুরীর ভেসে থাকবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সামান্য একটু বেশী বাতাস ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে ডুবুরীরা নিজেদের হাল্কা করে তুলতে পারে আর তার ফলে তাদের পক্ষে ওপরে উঠে আসাটাও সহজতর হয়ে যায়; আবার বাতাসের পরিমাণ সামান্য একটু কম হলেই শরীর ভারী হয়ে যায় বলে সে তখন নীচের দিকে নামতে থাকে।

ডুবুরীরা সাধারণভাবে একটা টেলিফোনের সাহায্যে উপরের সাথে সংযোগ রেখে থাকে। কিন্তু এই সংযোগ যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে বলে অন্য আর একটি সংযোগ রক্ষা করা হয় লাইফ-লাইন, বায়বীয় নল কিংবা অন্য কোন বিশেষ লাইনের মধ্য দিয়ে। এইসব লাইনের মাধ্যমে বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় সংযোগ রাখা হয়। যদিও এই সাংকেতিক ভাষায় কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় লাইফলাইনের মধ্য দিয়ে ডুবুরীর সাথে যে সংযোগ রয়েছে তার বিশেষ টান।

সাধারণভাবে কোমরের বেল্টটিকে বিভিন্ন সামুদ্রিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে তৈরী করা হয়। যেমন সমুদ্রের কতটা নীচে পর্য্যন্ত ডুবুরী যাবে বা সমুদ্রের স্রোতের গতি বা তীব্রতা কত ইত্যাদি। এইসবের ওপর নির্ভর করেই বেল্টের ওজন ৪০ থেকে ১৪০ পাউণ্ড বা ২০ থেকে ৭০ কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

আবার এইসব কারণেই ডুবুরীদের জুতোও তৈরী হয় বিভিন্ন মাপের ও বিভিন্ন ওজনের। জুতোর ওজন হয় ৫ থেকে ১৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। জুতো ভারী হবার কারণ হ'ল শিরস্ত্রাণের ওজনের সাথে পাল্লা দিয়ে শরীরটাকে জলের নীচে আনুভূমিক ভাসিয়ে রাখা। নাহলে মাথাটা সবসময়েই জলের নীচের দিকে পা-কে উপরে তুলে রাখত।

এত কথার পরও যে কথাটা মনের কোণায় নাড়া দিয়ে যায় তা হোল জলের তলায় ডুবুরীদের পথ দেখায় কে? ডুবুরীদের শিরস্ত্রাণে যে আলো লাগানো থাকে তা নীচে নামার সাথে সাথে অকেজো হয়ে পড়তে চায়। লবণাক্ত জলের গভীরে আলো তার পথ হারায়। বরং সেই তুলনায় নরম মাটি কিংবা কঠিন কোন বস্তুর সামনাসামনি আসতে পারলে আলোর প্রতিফলনের নিয়মে সেই আলো বস্তুকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। স্থলযান হিসেবে মোটরগাড়ী বা লরী যখন অন্ধকার কুয়াশার মধ্য দিয়ে পথ চলে তখন সে যেরকম বস্তুর প্রতিফলিত আলো দিয়ে পথ চেনে, ডুবুরীরাও ঠিক সেই রকম ভাবেই জলের ভেতরে পথ চিনে নেয়।

কিন্তু এত সাধ্যসাধনা করে ডুবুরীরা যে জলের তলায় গিয়ে আমাদের উপকার করবার জন্য সচেষ্ট হয় তাতেও বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক আক্রমণ হতে পারে।

উৎস মানুষ

বিশেষ যুগ্ম-সংখ্যা বেরোচ্ছে সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে। এ তে থাকবে ● প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কণ্ঠরোধ কেন হল ● ধর্মীয় মেলায় বিজ্ঞান অনুষ্ঠান ● সাপের মাথার মণি ● খনার বচন আসলে কি ● মন, সম্মোহন ও শারীরিক ক্রিয়া ● এছাড়া বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি। কাছের স্টলে বলে রাখুন॥ আমাদের ঠিকানা সম্পাদক, উৎসমানুষ। বি ডি ৪৯৪। সল্ট লেক। কলকাতা-৭০০০৬৪।

যে বাতাসের অভাবে মানুষ বাঁচে না সেই বাতাসই জলের তলায় ভিন্ন রকম ব্যবহার করে! ডুবুরীদের পোশাকের ভেতর বাতাস কম থাকলে সে যদি বাইরের জলীয় চাপের সাথে সমতা বজায় রাখতে না পারে তাহলে ডুবুরীর মাথার দিকে সমস্ত দেহের চাপ এসে পড়তে চায়; আবার এই বাতাস পোশকের ভেতরে থেকে চাপ সৃষ্টি করে ডুবুরীকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। আসলে সাধারণ সমুদ্রতল থেকে অনেক নীচে যেখানে মাথার ওপরকার জলের চাপ অনেক বেশী সেখানে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী গুণ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে হয়—যদিও এটা স্বাভাবিক ভাবেই দেহের চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। ডুবুরী যদি সম গভীরতায় থাকে তাহলে এর প্রভাব ততটা হয় না, কিন্তু ওপর-নীচ করতে গেলে যখন বাতাসের চাপ কম বা বেশী করাতে হয় তখনই অসুবিধা দেখা দেয়। মূলতঃ হঠাৎ করে বাতাসের চাপ কমে গেলে নাইট্রোজেন দেহের অভ্যন্তরে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করে। এই বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টির ফলে দেহের রক্ত চলাচল বাধা পায়, তার ফলে ওই গভীরতায় হার্টের ওপর চাপ এসে পড়ে। এইজন্য ডুবুরীদের নার্ভ যথেষ্ট পরিমাণ শক্ত না হলে তাদের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

এছাড়াও 'air embolism' বলে একরকম অসুখের সম্ভাবনা ডুবুরীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে। এই অসুখের মূল ব্যাপারটা হোল রক্তের দানা বেঁধে যাওয়া। যে কোন জায়গাতেই এই দানা বাঁধুক না কেন তা যেন অনেকটা জোর করেই ঢুকে পড়ে ফুসফুসের মধ্যে আর সেখান থেকে ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত রক্ত চলাচল ব্যবস্থাকেই বানচাল করে দিতে চেষ্টা করে।

এছাড়া সামুদ্রিক পরিবেশ থেকে ফেরার পর যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া ডুবুরীর শরীরে সাধারণতঃ দেখা যায় তা হোল—দেহের পেশীগত সংকোচন, দৃষ্টিশক্তির জড়তা, বধিরতার লক্ষণ, স্পর্শানুভূতির অভাব, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, মাথাধরা, পেটের গণ্ডগোল ইত্যাদি।

সমুদ্রের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা বর্জনের সাথে সাথে যে সমস্ত গ্যাস ডুবুরীরা গ্রহণ করে তা শরীরের ভেতরে গিয়ে চাপের তারতম্যের ফলে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। বুদ্‌বুদের মত হয়ে গিয়ে পেশীতে চাপ সৃষ্টি করে আর সেই চাপের ফলে সমস্ত শরীরে ব্যথা হয়; আর এই সৃষ্ট চাপ যদি মেরুদণ্ডের ভেতরে কোনরকমে জায়গা করে নিতে পারে তাহলে তা মানুষের 'প্যারালিসিস' পর্যন্ত করে দিতে পারে। আবার এইসব গ্যাস যদি মাথার ভেতরকার কোন নার্ভে ঢুকে পড়ে তাহলে ডুবুরীদের পক্ষে অন্ধ হয়ে যাওয়াও আশ্চর্যের নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ডুবুরীরা সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসার পর বেশ কিছুদিন স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে।

এইসব মনে রেখে যারা ডুবুরীর পোশাক পরেন তাদের তাই দরকার মানসিক ও শারীরিক শক্তি, প্রচণ্ডভাবে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থাকে মানিয়ে নেবার সাহস। কারণ যতই জলের তলায় যেতে থাকেন এরা ততই এদের কাজ করবার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সমস্ত পোশাকটা যেন গায়ে চেপে বসতে চায়, হাত-পা নাড়ানোই অসাধ্য হয়ে পড়ে। তবুও অসীম প্রত্যয় নিয়ে ডুবুরীদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয় অজানা বিপদের সাথে যুদ্ধের জন্য।

With best compliments from :

Premier Irrigation Equipment Pvt. Ltd.

P.O. & Vill—BORAL

Dist—24 Parganas

(W. B)

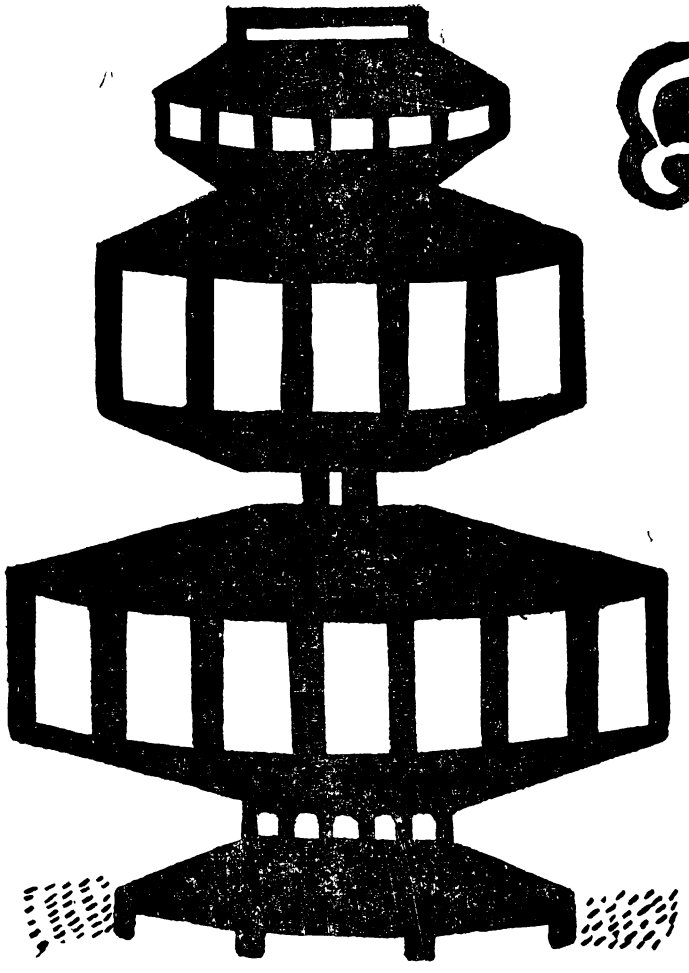

মৃত্যুঘর

হারমান ম্যাক্সিমভ

'সিম্‌-ক্রি' গ্রহের ইতিহাস যারা পড়েছে তারা জানে বহু বছর আগে ঐ গ্রহে আশ্চর্য এক মৃত্যুঘর বানান হয়েছিল। ওখানকার ইতিহাসের ৭৬নং অধ্যায়ের ৪৯১নং পরিচ্ছেদে মৃত্যুঘর প্রসঙ্গে যে কথা ক'টি লেখা আছে তা অনেকটা এইরকম :

শাসনকর্ত্তা 'লাক্‌-ইফার-শি'র আদেশে এক মৃত্যুঘর তৈরী করা হয়। অদ্ভুতদর্শন সেই বিরাট বাড়ীটি টিঁকে ছিল ঐ গ্রহের হিসেবে প্রায় ১৫ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন মানুষ যদি মনে করত—তার বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই, সে এসে দাড়াত মৃত্যুঘরের দরজার সামনে। তারপর কেউ তাকে আর কোনদিন দেখতে পেত না। ... 'ভেন্ট' নামে এক বিখ্যাত মেকানিক ঐ মৃত্যুঘর তৈরী করে। আশ্চর্যের কথা—ঐ লোকটা নিজেই আবার তা ধ্বংস করেছিল! ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক তাই না? ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে জানলে অবশ্য রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'এটাই তাহলে তোমার চরম সিদ্ধান্ত?'

বড় বড় হরফে এই কথাটা লেখা ছিল দরজার গায়ে। একসময় হরফগুলো লেখা হয়েছিল হলদে রঙে—এখন অবশ্য তাতে খানিকটা কালচে ভাব এসেছে। এটা যে নোংরা ধূলোর আস্তরণের জন্য তাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। দরজার গায়ে নখের আঁচড় দিয়ে তাড়াহুড়োয় লেখা অসংখ্য নাম—সেই তাদের নাম যারা এই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে আর কখনও বেরিয়ে আসবে না বলে। দরজার পাশে এক কোণে পড়ে রয়েছে নানা জিনিস-পত্রের স্তূপ—ভেতরে ঢোকার সময়ে দরজার বাইরে অবহেলায় যা সবাই ফেলে গেছে।

'এটাই তাহলে তোমার চরম সিদ্ধান্ত?'

এ প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করছে সবকিছু।

ভেল্ট-এর মনে হ'ল—বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ীর ঘা পেটাচ্ছে! কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ভেল্ট নীচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ'।

স্টীলের দরজাটা নিঃশব্দে সরে গিয়ে ভিতরে যাবার রাস্তা খুলে দিল। ভেল্ট দেখল, সামনে কি বিরাট সুড়ঙ্গের মুখ, ভিতরের ইলেকট্রিক বাল্বের গায়ে মাকড়সার জাল—তাই, যেন কেমন আধো অন্ধকার! 'ক্ল্যাক, ক্ল্যাক, ক্ল্যাক'—সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনতে পেল ভেল্ট। ঐ শব্দটুকু ছাড়া চারপাশে জীবনের আর কোন অস্তিত্ব নেই। ভেল্ট-এর মনে হল—এক ছুটে পালিয়ে যায় দরজার বাইরে—সূর্যের আলোয় বেড়ে ওঠা সতেজ ঘাসের বুকে।

কিন্তু ঘাসের বুকে ফিরে গেলেও নিজের অতীতকে তো আর এখানে এই দরজার পাশে রেখে যাওয়া যাবে না। মায়ের চোখের জল, বাবা আর ভাইদের ঘৃণা, এই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকা মানুষদের জীবনের শেষ অভিশাপ—এ সবই তো তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।

যদিও ওর শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু বলছিল 'না', ভেল্ট চীৎকার করে বলল, 'হ্যাঁ, সবকিছু ভেবেই আমি এখানে এসেছি।'

ভেল্ট-এর পেছনে দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। আধো অন্ধকার প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গিয়ে ভেল্ট ঢুকল ঠিক সামনের ঘরটায়। ঘরের মধ্যে আলোর জোর অনেক বেশী—ঘরের আকৃতিও কেমন অদ্ভুত—চারপাশের দেওয়াল, পায়ের তলার মেঝে, মাথার উপরে ছাত—সবকিছুই অসংখ্য ছোট ছোট আয়না দিয়ে মোড়া! অসংখ্য আয়নায় অসংখ্য প্রতিচ্ছবি! দেখে কেমন দৃষ্টি-বিভ্রম হয়—এই মনে হয়—ঘরখানা কি ছোট্ট, পরক্ষণেই তাই আবার বিশাল হলঘরের চেহারা নেয়!

ভেল্ট জানে—এটা আসলে 'স্বীকারোক্তি'র ঘর। ভেল্টের চারপাশে তার নিজের হাজার হাজার প্রতিবিম্ব! ঘরে ঢোকার সময়কার ভেল্টের সেই ভয়-ভয় ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে গেল। ভেল্ট দেখল—ঘরের এককোণে রয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের সেই যন্ত্রটা—তার সামনে রয়েছে একটা চেয়ার, আর একটা টেবিল। ভেল্ট এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় বসল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রটা প্রথাগতভাবে তার প্রশ্ন শুরু করল। 'কে তুমি—জীবনের শেষ চৌকাঠ পার হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ?'

এত মৃদু ও নম্রস্বরে কথাগুলো ভেসে এল যে প্রথমটায় ভেল্টও চমকে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। নাঃ, চারপাশে শুধু তারই নিঃশব্দ প্রতিচ্ছবি। ভেল্ট চোখ ফিরিয়ে আনল, মেশিনের দিকে। যন্ত্রটা তার পরিচয় জানতে চাইছে। ভেল্টের স্মৃতিতে ভীড় করে এল তার সেই ছোট্ট-বেলার কথা। ছোটবেলার সেই গ্রাম—ধূলো মাখা পায়ে পরণে ছোট এক হাফপ্যান্ট—'ভেল্ট' নামের একটা ছোট্ট ছেলে ছুটে যাচ্ছে তার বাড়ীর দিকে। তার মা তাকে ডাকছেন, তাকে খুঁজছেন। ভেল্ট ছুটতে ছুটতে এসে মুখ লুকোল তার মা'র কোলে।

'তোমার নাম কি?' যন্ত্র আবার প্রশ্ন করল।

এক ঝটকায় স্মৃতিগুলোকে মন থেকে ফেলে দেয় ভেল্ট। 'আমি ভেল্ট—নিপ-মা-গালিট্—এই 'সিম-ক্রি' গ্রহের সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে দক্ষ মেকানিক।'

'তুমি কবে এবং কোথায় জন্মেছ?'

ভেল্ট গ্রামের নাম এবং জন্মসময় জানাল।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ! যন্ত্রটা যেন ভেল্টের

উত্তরগুলো ঠিক কিনা তা মনে মনে যাচাই করছিল। একটু পরেই যন্ত্রের ভিতর থেকে কাঁপা কাঁপা খোনা স্বরে গান ভেসে এল। ঐ তীক্ষ্ণ আওয়াজে প্রথমে ভয়ে চমকে উঠেছিল ভেল্ট—গানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের পেট থেকে বিকট সব শব্দ বের হচ্ছিল! ভেল্টের মনে হল—কেউ যেন প্রচণ্ড জোরে তার থুতনীতে ঘুঁসি মেরেছে। ভয়ে, আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল ভেল্ট আর সেই সঙ্গে লাফিয়ে উঠল তার হাজার হাজার প্রতিবিম্ব।

'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! যে লোকটা মরতে চলেছে যন্ত্রটা তাকে কোথায় সান্ত্বনা দেবে, তা না—উল্টে এরকম পিলে-চমকান গলায় বিচ্ছিরি গান?' ভেল্টের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। যন্ত্রটা তখনও তার বুড়োটে গলায় গেয়ে চলেছিল সেই একঘেয়ে গান ঃ

'এ লোকটার যাবার কোন জায়গা নেই
আজ তাই এসেছে এখানে—এই মৃত্যুঘরে।···

যন্ত্রটা হঠাৎ গান থামিয়ে ছকে-বাঁধা ঢঙে জিজ্ঞাসা করল, 'যাদের সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক, এখানে আসার আগে তাদের কাছ থেকে কি বিদায় নিয়ে এসেছ?'

ভেল্টের কাছে প্রশ্নটা অবান্তর বলে মনে হল। বিরক্ত হল ও।

'তুমি কি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছ?' আবার সেই যান্ত্রিক প্রশ্ন। 'আমার কোন নিকট-আত্মীয় নেই। গালিট্ বংশের আমিই শেষ মানুষ।'

'তোমার বন্ধুদের বলেছ?'

'সিম-ক্রি' গ্রহে সৎ মানুষের সংখ্যা এখন খুবই কম।···আমার কোন বন্ধু নেই।'

'তাহলে, তুমি যে এখানে এসেছিলে—সে খবরটা আমি কাকে জানাব?' যন্ত্রের গলায় বিস্ময়।

ভেল্ট একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার শেষ খবরটা আমাদের শাসনকর্তাকে জানিও। শুনে উনি খুশি হবেন।'

হ্যাঁ, শাসনকর্তা অবশ্যই খুশি হবেন। অন্ততঃ তাঁকে ভেল্ট যেসব অপমানকর চিঠি লিখেছে তা মনে রেখে তার মৃত্যু সংবাদে লোকটাকে খুশি হতেই হবে। বড়জোর লোক দেখানোর জন্যে হয়তো বলবে—'আহা, আমাদের সবচেয়ে সেরা মেকানিক। সে কি না আত্মহত্যা করল!'

'সারা জীবনে তুমি কি কোনও ভাল কাজ করেছ?'

যন্ত্রের স্বর এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী অন্তরঙ্গ, নরম। ভেল্ট তার সারা জীবনে কি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি? নিশ্চয়ই করেছে। আসলে যে কোনও লোকের পক্ষেই একটাও ভাল কাজ না করে সারা জীবনটা কাটান মুশকিল। ভেল্ট চোখ বন্ধ করে তার ভাল কাজগুলোকে মনে করার চেষ্টা করল। হ্যাঁ মনে পড়ছে। ভেল্ট এমন জিনিস তৈরী করেছিল যার সাহায্যে আকরিকের খনি থেকে খুব সহজেই মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব। এটা নিশ্চয়ই খুব ভাল কাজ—তা না হলে, তার গ্রহ-বাসীরা তাদের চৌরাস্তার মোড়ে তার মূর্তি বসাত কি? তাছাড়া ভেল্ট তরঙ্গতত্ত্বের সূত্রও আবিষ্কার করেছিল। তবে তার আবিষ্কার—তার সৃষ্টির মধ্যে সব সেরাটি হল·····

'আমি যে জীবনে ভাল কাজ কিছু করেছি—তার তো প্রমাণ তুমি নিজেই। আমিই তো তোমাকে তৈরী করেছি।'

'আমাকে?' যন্ত্র অবাক হল।

'হ্যাঁ। শুধু তোমাকেই নয়—আমি তৈরী

করেছি এই বাড়ীর যাবতীয় জিনিস—আসলে আমিই এই মৃত্যু ঘরের স্রষ্টা।'

'তুমি সত্যি কথা বলছ তো?'

'মৃত্যুর আগে শেষ স্বীকারোক্তির সময় কেউ কি মিথ্যে কথা বলে?'

'বেশ তুমিই যদি এই মৃত্যুঘর বানিয়ে থাক তবে নিশ্চয়ই জান—এরপর তোমার কি হবে?'

'জানি', ভেল্ট দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল। আমার স্বীকারোক্তির পালা শেষ হলেই—সামনের ঐ দরজাটা খুলে যাবে। দরজার বাইরে সিঁড়ি নেমে গেছে।

যতদূর মনে পড়ছে—বিয়াল্লিশটা ধাপ আছে ঐ সিঁড়িতে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে যখন আমি নামব, তখন কোন একটা ধাপে পা রাখামাত্র ইলেকট্রিকের প্রচণ্ড শক্ খেয়ে গড়িয়ে পড়ব আমি। কোন ধাপে তুমি ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাঠাবে তা অবশ্য আমি জানি না। এক একজনের ক্ষেত্রে সেটা এক একরকম। ইলেকট্রিক শক্ খাবার পরও আমি পুরোপুরি মরে যাব না—সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আমার শরীরটা গিয়ে পড়বে একটা চৌবাচ্চায়। ঐ চৌবাচ্চায় রাখা আছে এক বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণ—যার সাংকেতিক নাম 'কিউ'। ঐ রাসায়নিক দ্রবণের সংস্পর্শে আসার মাত্র সাত সেকেণ্ডের মধ্যে আমার শরীরের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না!'

'উঁহু, তোমার প্ল্যাষ্টিকের বোতামগুলো থেকে যাবে।' যন্ত্র বলে উঠল। ভেল্টের মনে হল—যন্ত্রটা যেন এরজন্য যারপরনাই ক্ষুব্ধ। যন্ত্র বলে চলল, 'আসলে 'কিউ' দ্রবণে প্ল্যাষ্টিক গলে না। সেজন্যই আমাকে এরই মধ্যে অন্ততঃ তিনবার ড্রেন পাইপ পরিষ্কার করতে হয়েছে।'

ভেল্টের ইচ্ছে হল—হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। 'তাহলে ব্যাটা যন্ত্র, প্ল্যাষ্টিকের বোতামগুলো নিয়ে তুমি তো সত্যিই বড় ফ্যাসাদে পড়েছ!' ভেল্ট বুঝতে পারছিল, হাসির তুফান তার বুক থেকে গলা, গলা থেকে ঠোঁটে উঠে আসছে। হ্যাঁ, বুড়ি ঠাকুমারা যেমন তাদের নাতিরা প্যাণ্ট নোংরা করলে, কিংবা পরিবারের সঞ্চিত খাবার চুরি করে খেলে—ঘ্যানর ঘ্যানর করে এর ওর কাছে নালিশ করে, যন্ত্রটা ঠিক তেমনি ভাবে ওর ড্রেন পাইপের অসুবিধার জন্য অনুযোগ করছে। আহা, এই যে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে লোক এসে মৃত্যুঘরে ঢুকছে—তাতে যন্ত্রটার কোন আপত্তি নেই……শুধু যদি তাদের জামার বোতামগুলো প্ল্যাষ্টিকের বদলে অন্য কিছু দিয়ে তৈরী হোত!

"তুমি হাসছ?" যন্ত্রটা বলে উঠল। "এখানে আসার পর অনেকেই অবশ্য নার্ভাস হয়ে পড়ার জন্য এরকম ভাবে হাসে।"

ভেল্টের সারা শরীর হাসিতে আবার কেঁপে উঠল। যন্ত্র এবার চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, "এবার বল, সারা জীবনে তুমি কি কি খারাপ কাজ করেছ?"

যন্ত্রের গমগমে আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ভেল্ট বলল, "হ্যাঁ, আমি খারাপ কাজও করেছি।"

"কি সেটা?"

"আমি তোমাকে তৈরী করেছি।"

"তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা।" যন্ত্র বলল। "তুমি তো একটু আগেই বললে—আমাকে তৈরী করাটাই নাকি তোমার জীবনের সবচেয়ে ভাল কাজ?"

"ভাল কাজটাই একসময় খারাপ হয়ে যায়…"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!" যন্ত্রের স্বরে

অসহায়তা ফুটে উঠছিল।

"কি করে বুঝবে? আসলে তো তুমি একটা যন্ত্র।" ভেল্টের ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি দেখা দিল।

"কিন্তু আমি যে তোমার কথাগুলো বুঝতে চাই। ভাল কাজটা কেন খারাপ হয়ে গেল? আচ্ছা, তুমি তখন কেন বলেছিলে, আমাকে সৃষ্টি করে তুমি জীবনের সবচেয়ে ভাল কাজ করেছ?"

"আমার ধারণা ছিল—আমি এমন কিছু একটা সৃষ্টি করছি যা আমাদের গ্রহের সমস্ত মানুষকে সাহায্য করবে…"

ভেল্টের কথা শেষ হবার আগেই যন্ত্র বলে উঠল, "সাহায্য করবে? মারা যেতে সাহায্য করবে?"

"না। আমি ভেবেছিলাম—এই মৃত্যুঘর আমার গ্রহবাসীদের বেঁচে থাকতেই সাহায্য করবে।"

"বুঝতে পারলাম না।"

হ্যাঁ সত্যিই তো, একটা যন্ত্র এটা বুঝবে কি করে? আসলে একটা মানুষ তখনই স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে যখন তার মারা যাওয়াটা থাকে তার নিজের হাতের মধ্যে। যখন একটা মানুষের বেঁচে থাকার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন যদি বিনাকষ্টে মারা যাওয়ার কোন সহজ উপায় তার হাতের কাছে থাকে—তবে তার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? ভেল্টের মনে পড়ল, তাদের গ্রহের প্রধান শাসন কর্তা লাক্-ইফার এইসব কথাগুলোই বলেছিলেন তাকে। যারা বৃদ্ধ—চোখে দেখে না, কানে শোনে না, বেঁচে থাকার কোন আগ্রহই যাদের নেই, অথচ আত্মহত্যা করতে ভয় পায়—তাদের কাছে মৃত্যুঘর তো আশীর্বাদের মত। লাক্-ইফার বলেছিলেন, "আমি যখন বুড়ো হব, 'সিম-ক্রি' গ্রহের শাসনভার যখন আর বইতে পারব না—তখন আমিও নির্দ্বিধায় গিয়ে দাঁড়াব মৃত্যুঘরের দরজায়।" লাক্-ইফার একটু থেমে আবার শুরু করেছিলেন, "যে মানুষের বেঁচে থাকার কোন আগ্রহ নেই তাকে বাঁচিয়ে রাখা শুধু অর্থহীনই নয়, উল্টে সে তো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যাদের কাছে নিজেদের জীবনেরই কোন মূল্য নেই তারা তো সমাজের আর পাঁচজন মানুষেরও বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও অর্থ খুঁজে পায় না।…আসলে যারা মরতে চায় তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করাটাই তো আমাদের উচিৎ।"

ভেল্টের মনে পড়ে—শাসনকর্তার ঐ কথা তখন অনেকেই মেনে নেয় নি। তারা বলেছিল ঃ

এসব কথা মিথ্যে।

এসব অন্যায়, অপরাধ।

এসব চিন্তা পাপ।

এইসব কথাগুলোর মধ্যে সত্যতা কিছু থাকলেও জোর গলায় কেউ তা বলে নি। আসলে শাসনকর্তার বিরুদ্ধে চীৎকার করে কিছু বলার সাহসও কারোর ছিল না। ভেল্টের কানে এসব অভিযোগ পৌঁছোয় নি—ও আপন মনে ওর কাজ করে গেছে। মৃত্যু-ঘরের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে একটা বিশেষ উপত্যকাকে বেছে নিয়েছিল ভেল্ট। জায়গাটার চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। একুশটা আলাদা আলাদা টানেল তৈরী করেছিল ভেল্ট—যার প্রত্যেকটার ভিতর দিয়ে মৃত্যুঘরের মূল দরজাগুলোয় গিয়ে পৌঁছানো যায়। মৃত্যুঘরের দিকে যাবার সময়ে যাতে একজন মানুষের সাথে আর একজনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করে মৃত্যুঘরের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষদের জীবনের শেষ সময়টুকুতে শান্তির ছোঁয়া দেয়, সহানুভূতির

সঙ্গে তাদের অন্তিম ইচ্ছাপূরণে এগিয়ে নিয়ে যায়।

"তুমি বলতে চাও, মৃত্যুঘর তৈরী করে তুমি এ গ্রহের মানুষের জীবনকে সহজতর করেছিলে?"

আবার প্রশ্ন! প্রথমটায় চমকে উঠেছিল ভেল্‌ট—। স্মৃতিচারণা করতে করতে যন্ত্রটার অস্তিত্বের কথাই ও ভুলে গিয়েছিল।

"না," ভেল্‌ট জবাব দিল। "যা ভেবেছিলাম—সবকিছুই ঠিক তার উল্‌টো হয়ে গেল।"

হ্যাঁ, যে প্রত্যাশা নিয়ে ভেল্‌ট মৃত্যুঘর বানিয়েছিল—সেগুলি কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। মৃত্যুঘর আত্মহত্যার ব্যাপারটাকে আইনের আশ্রয় তো দিলই, সেইসঙ্গে মানুষকে আত্মহত্যা করতে উৎসাহিত করল। হতাশাগ্রস্থ মানুষরা সব দলে দলে আসতে লাগল মৃত্যুঘরের দরজায়। জীবনে পোড় খাওয়া মানুষ যেমন আসত তাদের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়োতে—তেমনি মূহুর্তের উত্তেজনাও বহু মানুষকে টেনে আনত ঐ মৃত্যুপুরীতে। ক্রমে মৃত্যুঘরে ঢুকে আত্মহত্যা করাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল।

ভেল্‌টের যাবতীয় খাটনী বিফলে গেল। মৃত্যুঘর তার সেই অপকীর্তির প্রতীক হয়ে রইল। ভেল্‌টের মনে পড়ে—হাজার হাজার চিঠি আসত প্রতিদিন। প্রত্যেকটা চিঠির মধ্যে দিয়ে মানুষের অভিশাপ এসে পৌঁছত তার কাছে। ভেল্‌ট তার চারপাশে অবিরাম ফিস ফিস শব্দ শুনতে পেত। কখনও-কখনও তার মনে হোত—কেউ বুঝি তার পাশে গুমরে গুমরে কাঁদছে—কান্নার মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছে, "তুমি অপরাধী। মৃত্যুঘর বানিয়ে তুমি পাপ করেছ।"

ভেল্‌টের একসময় মনে হয়েছিল—ও পাগল হয়ে যাবে। আর সেই ভয়েই ও পালিয়েছিল ওর পরিচিত লোকজনের থেকে অনেক দূরে—ওর গ্রহের একেবারে অন্য প্রান্তে। সেখানে অচেনা লোকের মাঝে অন্য পরিচয়ে বহু বছর কাটানোর পর ভেল্‌টের মনে হয়েছিল—এইবার ও নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। নিশ্চয়ই এতদিনে সবাই ওর কথা ভুলে গেছে।

ভেল্‌টের দুর্ভাগ্য—কেউ ওকে ভোলে নি। বহু দিন বাদে ওকে দেখতে পেয়ে প্রথম যে বুড়িটা ছুটে এসেছিল তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ছিল ভেল্‌টের।

"শ্রদ্ধেয় ভেল্‌ট, আপনি বলুন—সত্যিই কি আপনার মৃত্যুঘরের মধ্যে ঢুকলে কোনরকম ভয়ডর থাকে না?"

"তার মানে?" ভেল্‌ট প্রশ্নটা বুঝতে পারে নি।

আমার নাতি—একেবারে বাচ্চা। বিশ্বাস করুন, ওর বয়স আঠারো বছরও পেরোয় নি। সেও নির্ভয়ে মৃত্যুঘরে..."

ভেল্‌ট আর দাঁড়াতে পারে নি—ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে।

সন্ধ্যেবেলা দেখা হয়েছিল পুরোন বন্ধু উরাম-কারাখের সাথে। ওর কাছেই ভেল্‌ট সেই ট্যাবলেটের কথা জানতে পারে। উরাম ফিসফিস করে বলেছিল, "ট্যাবলেটগুলো আসলে এত ছোট যে দেখলে তোমার বালির দানা বলে ভুল হবে। ওর একটা খেলেই যে কারোর আত্মহত্যা করার প্রবণতা জাগে। অনেকে আবার বলছে—আমাদের শাসনকর্তা লাক্‌-ইফারের কারসাজিতেই নাকি এই 'বিষ' বাজারে অঢেল মিলছে। কে বলতে পারে—যে সব লোকেরা আমাদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়—তাদের এগুলো খাওয়ান হচ্ছে না?"

*

পুরনো কথাগুলোই ভাবছিল ভেল্‌ট—ভাবনা-

গুলো ধাক্কা খেল যন্ত্রের কথায়।

"আর কিছু বলার থাকলে বলতে পার। স্বীকারোক্তির জন্য আরও চারমিনিট সময় তুমি পাবে।"

"কি লাভ?" ভেল্‌ট নিরাসক্ত গলায় বলল।

"তার মানে—তুমি কি মারা যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব?"

উঁহু। আমি আসলে তোমাকে ধ্বংস করার জন্যই উদ্‌গ্রীব।" ভেল্‌ট কথাগুলো যেন ছুঁড়ে মারল। "আমাকে ধ্বংস করবে? সে ক্ষমতা তোমার নেই।"

"ভুলে যেও না—আমিই তোমার সৃষ্টিকর্তা!"

"কিন্তু তোমার কাছে তো কোন অস্ত্র নেই।"

"আমি নিজেই নিজের অস্ত্র।"

ভেল্‌টের চোখে মুখে এখন উৎসাহ ঝিলিক দিচ্ছে। হ্যাঁ, ভেল্‌ট তো জানতই—মৃত্যুঘর কোন মানুষকেই অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেয় না। আসলে ভেল্‌টই তো এ কায়দাটা করেছিল যাতে বাইরে থেকে কেউ একে ধ্বংস না করতে পারে। ভেল্‌টকে তাই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

"এখানে ঢোকার আগে আমি দু'টো 'সিটেন' ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছি।

"সিটেন'টা কি?"

"একটা রাসায়নিক পদার্থ।" ভেল্‌ট জবাব দেয়, "একটু পরেই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে যেই আমি ছিটকে পড়বো চৌবাচ্চায় রাখা 'কিউ' দ্রবণের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে *'সিটেনে'র যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে তার ফলেই* একটা জোরালো বিস্ফোরণ হবে এবং……।"

"অ্যাঁ, বিস্ফোরণ? না তা আমি হতে দেবনা। আমি তোমাকে সিঁড়ির কাছে যেতেই দেব না।" যন্ত্র অগাধ প্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো বলল।

"না, তা তুমি করতে পার না। যে মানুষ এক বার মৃত্যুঘরের চৌকাঠ মাড়িয়েছে, সিঁড়ির কাছে সে যাবেই, তাকে আটকানোর সাধ্য কোন যন্ত্রেরই নেই।" ভেল্‌ট থেমে থেমে জোর দিয়ে কথাগুলো বলে গেল আর তারপর এগিয়ে গেল ঘরের একটা বিশেষ দেওয়ালের দিকে।

"আমি ভেল্‌ট, এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

দেওয়ালজোড়া আয়নার কিছুটা অংশ সরে গিয়ে ভেতরে যাবার সরু একটা রাস্তা বেড়িয়ে পড়ল ভেল্‌টের সামনে

"একটুখানি দাঁড়াও।" ভেল্‌ট দেখল মৃত্যুঘরের যন্ত্রটা বাঁচার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

"দাঁড়াও। মৃত্যুঘরকে তুমি এভাবে ধ্বংস কোর না। আমি তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"তোমাকে সে ক্ষমতা আদৌ দেওয়া হয়নি—আর কেউ না হোক, আমি তো এটা জানি।"

"তুমি ঠিকই বলেছ," যন্ত্রের গলায় বিষন্নতার ছোঁয়া; "বেশ তবে বিদায় জানাচ্ছি তোমাকে; সামনের দরজা দিয়ে এগোলেই সিঁড়ির ধাপ শুরু।"

"বিদায়", ভেল্‌ট যন্ত্রের দিকে শেষবারের মত ফিরল। সিঁড়ির দিকে এগোনোর আগে নিজের হাজার হাজার প্রতিবিম্বের কাছ থেকেও হাত নেড়ে বিদায় নিল ভেল্‌ট।

অনুবাদঃ অমিত চক্রবর্তী

শিল্পী থেকে বিজ্ঞানী
স্যামুয়েল মর্স

মনোজ ঘোষ

'নাম্বার এইট প্লিজ'—

টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মীকে কেউ হয়তো কথাটা বললেন। কয়েকশো মাইল দূরে কোনো বন্ধুকে খুব দরকারী কোনো খবর. হয়তো পাঠাতে চান তিনি। ডট-ড্যাস-ডট—বিখ্যাত মর্স কোডের কাজ তখনই শুরু হয়ে যায় এবং লোকটি কাউণ্টার ছাড়ার আগেই হয়তো বন্ধুর কাছে সেই খবর পৌঁছে যায়।

দূরত্বের বাধা অতিক্রম করে প্রায় চিন্তার গতিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাঁর জন্যে সম্ভব হয়েছে তিনি কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন নাম-করা চিত্রশিল্পী।

হ্যাঁ, স্যামুয়েল মর্সের কথাই বলছি। যৌবনে তিনি একটির পর একটি সুরম্য চিত্র এঁকেছেন আর স্বপ্ন দেখেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শিল্প-ঐশ্বর্যকে যাঁরা পুনরাবিষ্কৃত করবেন তিনি হবেন তাঁদেরই একজন; রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জোলো এবং টিশিয়ানের প্রতিভার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সেই লণ্ডনের রয়াল একাডেমিতে তাঁর ছবি স্থান পেলেও পৃথিবীর মানুষের কাছে মর্স আজ টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক হিসাবেই পরিচিত।

১৭৯১ সালের ২৭ এপ্রিল বসটনে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ধর্মযাজক জেডিয়া মর্স। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উৎসাহ দেখা যায়। ভাই সিডনির সঙ্গে নানা পরীক্ষায় মেতে থাকতেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার

আগে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা তিনি উৎসাহ নিয়ে শুনতেন, অবসর সময় ছবি এঁকে পাঠাতেন।

কিন্তু ক্রমশঃ চিত্রশিল্পের প্রতি তিনি বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বাবার কাছে অনেক অনুনয় করে ১৯১১ সালে চিত্রকলা নিয়ে পড়াশুনোর জন্যে ইউরোপে পাড়ি দেন। ইউরোপ থেকে বাড়িতে প্রথম চিঠি লেখেন,— 'ইচ্ছে করে আমার চিঠিখানা তোমরা যেন এখনই পাও। কিন্তু তিনহাজার মাইল তো আর এক মুহূর্তে পার হওয়া যায় না।' লণ্ডনে যে চার বছর ছিলেন সেইসময় তিনি বিখ্যাত আমেরিকান চিত্রশিল্পী বেনজামিন ওয়েসটের কাছে কলাবিদ্যা শেখেন এবং কয়েকটি সুন্দর ছবিও আঁকেন।

বসটনে ফিরে এসে মর্স একটা স্টুডিও খোলেন।

স্টুডিয়োতে লাভ হত খুবই কম। তাঁর দেশের লোকেরা তখনো পোর্ট্রেট ছাড়া অন্য কোন ছবির বিচার করতে শেখে নি। বাধ্য হয়ে তখন ইজেল কাঁধে করে তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। ১৮১৬ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত তিনি নিউ ইংলণ্ড থেকে ভারমুন্টের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে একাত্তর থেকে ছিয়াত্তর টাকায় এক একটা পোর্ট্রেট এঁকেছেন।

সেইসময় নিউহ্যাভেনে লুক্রেসিয়া ভেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লুক্রোসিয়া তাঁকে অনেক কাজে সাহায্য করেন; তাঁদের বিবাহিত জীবনকে সুখে শান্তিতে ভরিয়ে রাখেন। মর্স যখন ওয়াশিংটনে হ্যামিলটনের পোর্ট্রেট আঁকায় ব্যস্ত তখন স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে আসে। নিউ হ্যাভেন থেকে ওয়াশিংটনে এই খবর পৌঁছোতে সময় লাগে ছ'দিন। অথচ দূরত্ব মাত্র চারশো মাইলের কিছু কম।

লুক্রেসিয়ার মৃত্যুতে মর্স খুব ভেঙে পড়েন। তাঁদের তিনটি সন্তান আত্মীয়দের বাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২০ সালে তিনি আবার ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিন বছর পর দেশে ফেরার পথে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ডক্টর চার্লস জ্যাকসন নামে বসটনের জনৈক ভদ্রলোক জাহাজের লোকেদের আনন্দদানের জন্যে নানারকম বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দেখাচ্ছিলেন। তাই দেখে মর্সের মনে হয় বিদ্যুৎকে ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলে মানুষের ভাষাকেও মুহূর্তের মধ্যে দূরে পাঠানো হয়তো অসম্ভব নয়। মাইলের পর মাইল তারের ভেতর দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে—ডক্টর জ্যাকসনের এই কথা শুনে মর্স ভাবেন, তারের যে-কোন অংশে বিদ্যুতের উপস্থিতিকে যদি দেখানো সম্ভব হয় তবে মানুষের ভাষাকেও বিদ্যুতের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক অংশ থেকে অন্য অংশে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব।

আমেরিকায় ফিরে এসে তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা ও স্থাপত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল একাডেমি অফ ডিজাইন তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসময় চিত্রকলা সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। অনেকের মতে আমেরিকায় তিনি প্রথম এ ধরণের বক্তৃতার সূত্রপাত করেন। কিন্তু টেলিগ্রাফের চিন্তা ক্রমশ আরো বেশি করে তাঁকে পেয়ে বসে। একটু একটু করে এবং একসময় তিনি একেবারেই আঁকা ছেড়ে দেন। ১৮৩৭ সালের পর মর্সের আঁকা মাত্র একখানি পোর্ট্রেট পাওয়া যায়।

মর্স যে রাতারাতি টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেছিলেন এমন নয়। ১৮২২ সাল থেকেই তড়িৎ সম্পর্কীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। অধ্যাপক বেনজামিন সিলিম্যানের ল্যাবরেটরীর পাশেই একসময় তিনি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেক দিন সিলিম্যানের ল্যাবরেটরীতে যেতেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস ডানার সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা হয়। ১৮২৭ সালে তিনি ডানার কাছে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ধারাবাহিক পাঠ নেন। তখন তড়িৎ চুম্বকের বিভিন্ন পরীক্ষা দেখারও সুযোগ পান। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় সেখানকার রসায়নের জনৈক অধ্যাপক বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানকে পরিস্ফুর্ত করতে সাহায্য করেন।

সুদীর্ঘ কষ্টসাধ্য প্রয়াসে ১৮৩৬ সালে তাঁর ডট ও ড্যাসের বর্ণমালাযুক্ত আবিষ্কারটি পরিশীলিত রূপ পেলেও সেটিকে সর্বসাধারণের সামনে হাজির করতে আরো আট বছর সময় লাগে। যে শিল্পী একদিন রঙ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেছেন—কোন রঙকে

দুধে, কোনটি বা বীয়ারে মিশিয়ে বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করেছেন—তিনিই তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের নক্সা আঁকতে শুরু করেন। ১৮৩৮ সালে তিনি নিজের আবিষ্কারের একটি পেটেন্ট নেন। ১৮৪৪ সালের ৪ঠা মে তারিখে তাঁর বন্ধু আলফ্রেড ডেলকে ওয়াশিংটন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বালটিমোরে প্রথম তারবার্তা পাঠান: 'WHAT HATH GOD WROUGHT'। ডেল ঐ কথাগুলোই তাঁদের ভাষায় ফিরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মর্সের পরীক্ষা সফল হয়।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমেরিকার বড় বড় শহর এবং ইউরোপের অনেক দেশে টেলিগ্রাফের প্রবর্তন হয়। নানা দেশ থেকে মর্স সম্মান ও পদক লাভ করেন। তুরস্কের সুলতান তাঁকে 'নিশান ইফতিকার' নামে একটি সুদৃশ্য হীরকখচিত পদক উপহার দেন। প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়ার রাজা দেন সোনার পদক ও নস্যদানী। ১৮৫৮ সালে ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, রাশিয়া, সুইডেন ও তুরস্ক সম্মিলিত-ভাবে চার লক্ষ ফ্রাঁ দিয়ে মর্সকে সম্মানিত করেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অফ লেটার্স' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৭১ সালে আমেরিকার টেলিগ্রাফ কর্মীরা জীবিতকালেই তাঁর একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন করে মর্সের প্রতি অভূতপূর্ব সম্মান দেখান।

মর্স পৃথিবীর প্রথম তারবার্তাটি পাঠাবার পর গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে বার্তা-প্রেরণের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। কয়েকবছর আগে চাঁদ থেকেও মানুষ পৃথিবীতে খবর পাঠিয়েছে। আমরা অনেকেই হয়তো তাতে চমক ও উত্তেজনা অনুভব করেছি। কিন্তু মর্সের পাঠানো প্রথম বার্তাটি যাঁরা সর্বপ্রথম দূরভাষী যন্ত্রে শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের সেই বিস্ময় ও উদ্দীপনার তীব্রতার সঙ্গে হয়তো আর আর কিছুরই তুলনা চলে না। প্রথম বলেই তা অতুলনীয়।

Sri Annapurna Cotton Mills & Industries Ltd.

Regtd. Office :

P-10, New Howrah Bridge Approach Road, Calcutta-700001

Phones 26-7745 & 27-4811 Telex 021-7424

Founder

Late Girija Prasanna Chakravarti

Manufacturers of :

Hank Yarn, Hosiery Yarn, Grey Cotton Fabrics—Medium, Fine, Superfine.

Spindles : 28,104 Looms 400

Factory

Shamnagar, 24-Parganas.

——:*:——

Subsidiary Company

Asher Textiles Ltd.,

(Spindles : 30,320)

Avanashi Road,

Chandinagar P.O.,

TIRUPUR-638603

(S. India).

Phones 20065, 20198 Telex 0855-298.

মিসিং লিংক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

অমিতেশ লেখাপড়ায় ভালো, এম্-এস-সি পাশ করার পর জীবাণু বিজ্ঞানের ওপর রিসার্চ শুরু করে একটা পি-এইচ-ডি ডিগ্রীও পেয়েছে। অতঃপর কি করা যায়? ওদের মস্ত বড় পারিবারিক ব্যবসা। বাবার ইচ্ছা, অন্যান্য ভাইদের মত ও তার মধ্যে পড়ুক। মা বললেন, 'যদি ব্যবসা পছন্দ না হয় তাহলে কোনও কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে একটা ভালো চাকরি নিশ্চয়ই পাবি। তাই না হয় কর; তারপর বিয়ে করে সংসারী হ। আর কত দিন এ রকম ফ্যা ফ্যা করে বেড়াবি?'

কিন্তু নাঃ, অমিতেশের এর কোনটাই পছন্দ নয়। ছেলেবেলা থেকেই তার বাতিক দেশভ্রমণের। নিজের দেশের অনেক জায়গাই সে ঘুরেছে, কিন্তু পৃথিবীটা তো অত ছোট্ট নয়। এই পৃথিবীটাই যদি ভালো করে ঘুরে না দেখতে পারল তাহলে আর কি দেখল?

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা তার কাজ হল কোন বড় লাইব্রেরীতে গিয়ে বিদেশী খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়া—যদি তার মধ্যে বাইরের কোন ভালো চাকরীর বিজ্ঞাপন থাকে। আর এই রকম পড়তে পড়তেই হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ল বিখ্যাত জীবাণু-বিজ্ঞানী ডক্টর বোস্কিমুরার দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন। প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূর ক্রিসমাস আইল্যাণ্ডের কিছুটা উত্তর-পূর্বে মেক্সিকোর কাছাকাছি একটা ছোট্ট দ্বীপে তিনি একটি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট অর্থাৎ কিনা গবেষণাগার বসিয়েছেন। না, কোন ইউনিভার্সিটি নয়,—শুধুই গবেষণা হবে সেখানে। তারই জন্য তিনি দুজন সহকারী খুঁজছেন যারা নাকি জীবাণুবিজ্ঞানে কিছুটা অভিজ্ঞ। পারিশ্রমিক খুব একটা বেশী না হলেও এদেশের তুলনায় ভালোই হবে। অন্ততঃ অমিতেশের তাই মনে হল, আর সঙ্গে সঙ্গে সে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল।

তারপর আশ্চর্য কাণ্ড, ডক্টর বোস্কিমুরা, দেখা গেল ওকেই মনোনীত করেছেন আর সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে কাজে যোগ দিতে আহ্বান করেছেন।

বাড়ীতে একটু মৃদু আপত্তি উঠলেও তাঁদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে একদিন সত্যি সে রওনা দিল সেই অজানা দ্বীপ কুহেটিকার উদ্দেশে। ম্যানিলা পর্যন্ত প্লেন, বাকিটা জলযাত্রা, তাও মালটানা জাহাজে। তা এও একটা নতুন অভিজ্ঞতা বই কি!

যথাসময়ে কুহেটিকায় জাহাজ ভিড়ল। একাই নামল অমিতেশ। এদিক ওদিক চাইতেই লক্ষ্য করল একটি আমেরিকান যুবক তারই দিকে আসছে। ছেলেটি তারই বয়সী হবে।

কাছে এসে যুবকটি বলল, 'আপনি কি বোস, আই মীন ডক্টর বোস। আপনাকে রিসিভ করার জন্যই ডক্টর বোস্কিমুরা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার নাম এমার্সন। আমিও আপনারই মত ওঁর একজন সহকারী। ভালো কথা, জাহাজের জামা-কাপড় বদলে এই পোশাকটা পরে নেবেন।'

ডঃ বোস্কিমুরার সঙ্গে আলাপ করে অমিতেশের ভালো লাগল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চুলে একটু পাক ধরেছে। অমিতেশের পুরো নাম—অমিতেশ বসু, ইংরেজীতে ও লেখে 'বোস'। বোস্কিমুরা হেসে বললেন, 'আমিও কিন্তু বোস। আবার ঠাকুরদা বাঙ্গালী ছিলেন, মাতামহ জাপানী। ঠাকুমা, মা দু'জনেই জাপানী। কাজেই আমি দুটোয় মিশে গেছি। জাপানেই জন্ম, ওখানেই পড়াশোনা কাজেই মোটামুটি জাপানীই হয়ে গেছি কিন্তু সামান্য একটু বাংলাও শিখেছি। তাগোর আমার খুব প্রিয়, কিন্তু সব বুঝিনা।'

ল্যাবরেটরী দেখে অমিতেশ অবাক হয়ে গেল। এই জনবিরল দ্বীপে এত টাকা খরচ করে এমন একটা সুন্দর গবেষণাগার করার মানে ?

ডক্টর বোস্কিমুরাই জবাব দিলেন। 'এ অঞ্চল, বিশেষ করে এই দ্বীপটা নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত জীবাণুতে ভর্তি। কাজেই জীবাণু নিয়ে গবেষণা করার পক্ষে এটা চমৎকার জায়গা। তবে, খুব সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে। এজন্য আমি একটা অ্যান্টি-মাইক্রোব পোশাক তৈরি করিয়েছি। ওয়াটারপ্রুফের মত ওটা সব সময়ে জামাকাপড়ের ওপর পরে নেবেন। এমার্সন বোধহয় আগেই দিয়ে দিয়েছে। আর, ল্যাবটরীতে কাজ করবার সময় একটা গ্যাস-মাস্ক পরে নিয়ে কাজ করাই ভালো। সাংঘাতিক সব জীবাণু এখানে!'

ল্যাবরেটরীর একদিকে সযত্নে রাখা হয়েছে একটা ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ। সাধারণ মাইক্রস-কোপে কোন কিছু দেখতে হলে সাধারণ আলোয় রেখেই তা দেখা হয়। কিন্তু এই ধরণের মাইক্রস-কোপে আলোর বদলে ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রনের ঝাঁক। এর ফলে এতদিন খুব শক্তিশালী মাইক্রস-কোপেও যে জিনিসকে ২,০০০ গুণের চেয়ে বড় করে দেখা যেত না, এই মাইক্রসকোপে তা-ই দেখা যায় অন্ততঃ ১০,০০০ গুণ বড়। অমিতেশ আগে কখনও এ জিনিস ব্যবহার করেনি। এমার্সন দেখিয়ে দিল। একটা কাগজ পাৎলা ফালি করে তার ফিগারটা এর নীচে ধরতেই মনে হল যেন একটা বড় বিছানার চাদর ওখানে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।

যথা সময়ে কাজ শুরু হল। দ্বীপটা তেমন বড় নয়, আর লোকজনও খুব কম। কিছু আদিবাসী—তারা সবাই প্রায় জেলে, আর কিছু কাঠের ব্যবসায়ী। তাছাড়া রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের লোকেরা, ব্যাস্। ডক্টর বোস্কিমুরা অবশ্য একটা ছোট হাস-পাতালেরও ব্যবস্থা রেখেছেন। একজন ডাক্তার আর জনা দুই নার্স আছে সেখানে। তারা সবাই আমেরিকান।

দ্বীপটার বেশির ভাগই জঙ্গল, কিছু জলাভূমি আর ব্যাকওয়াটারও আছে। কিন্তু এত বিচিত্র রকমের গাছপালা অমিতেশ এর আগে কোথাও দেখেনি।

বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন বোস্কিমুরা কোত্থেকে ছোট্ট একটুকরো পাথরের খণ্ড চিমটে দিয়ে ধরে নিয়ে এসে বললেন, 'এটা ইলেকট্রন মাই-ক্রস্‌কোপে পরীক্ষা করতে হবে। ওপরের একটা চিলতে তুলে নিয়ে স্লাইড বানাতে হবে, যেমন জিও-লজির বেলায় পাথর ঘষে নিয়ে বানানো হয়। কিন্তু খবরদার, হাত দিয়ে ছুঁও না, সব সময় চিমটে ব্যবহার করবে।'

অমিতেশ দেখল একটা কালো পাথরের নুড়ি। [তবে সাধারণ ঐ মাপের পাথরের তুলনায় বেশ ভারী।] তার গায়ে জায়গায় জায়গায় সাদা ফুটকি দেওয়া। এমার্সনের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। ইলেকট্রন

বোস্কিমুরা কোত্থেকে ছোট্ট এক টুকরো পাথরের খণ্ড চিমটে দিয়ে ধরে নিয়ে এসে বললেন…

স্মাইক্রকোপে কিছু পরীক্ষা করতে বললে সে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসে।

স্লাইড তৈরি হ'ল। অতি সন্তর্পণে তার ওপর চোখ রেখে এমার্সন অমিতেশকে কাছে ডাকল, অমিতেশ ভাল করে লক্ষ করে দেখল বিরাট কালো এবড়ো খেবড়ো জমিন, তার এখানে সেখানে ছোট ছোট কতগুলো দানা। অনেকটা তাল পাকানো ফিটকিরির দানার মত দেখতে। ও ডক্টর বোস্কিমুরাকে খবরটা জানাল।

শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার পর বললেন, 'হুঁ, এরকম পাথর-কুচি আরও একটা পাওয়া গেছে, সেটিও ভালো করে দেখতে হবে। কিন্তু খবরদার, ছুঁও না ওগুলো।'

পাথরকুচিটি দেখবার প্রাথমিক ভার এবারও এমার্সন নিজে যেচে নিল, আর, দেখা গেল, আগেকার মত এটিরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কালো জমিনের ওপর সাদা সাদা স্ফটিকের দানা।

ডক্টর বোস্কিমুরাকে বেশ উত্তেজিত মনে হ'ল। দেখা গেল লাইব্রেরী-ঘরে বসে তিনি একটার পর একটা নতুন-আসা পত্রিকা নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ছেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে এমার্সনকে দেখতে পাওয়া গেল না। ব্যাপার কি জানবার জন্য তার ঘরে গিয়ে অমিতেশ দেখে—তার সারা মুখ, হাত-পা ফুলে লাল হয়ে উঠেছে,—যেন কোন বিষাক্ত পোকা সারা গায়ে কামড়েছে। চোখ দু'টো আরো লাল। ভালো করে সে কথা বলতে পারছিল না। ও ছুটে গিয়ে ডক্টর বোস্কিমুরাকে খবরটা দিল, তিনি ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।

বিকেলের দিকে দেখা গেল এমার্সন প্রায় অর্ধ-অচৈতন্য। নার্স দু'জন রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে।

ডাক্তারটিও। ডাক্তার বললেন, 'ওকে অবিলম্বে ইউ-এস্-এ কিংবা মেক্সিকোর কোন বড় হাসপাতালে পাঠান দরকার। ব্যাপার সুবিধের ঠেকছে না।'

কিন্তু কেন এমনটা হ'ল? ডক্টর বোস্কিমুরার প্রশ্নে এমার্সন ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল যে কাজটা তাড়াতাড়ি করার জন্য সে পাথরকুচিটা অনেকক্ষণ হাতে ধরে রেখেছিল। তখন কিছু মনে হয় নি, কিন্তু তার ঘণ্টা খানেক পরেই ওর গা চুলকোতে থাকে, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করতে থাকে, তার পর—

অমিতেশ দেখল—বোস্কিমুরা সব জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য আগেই তৈরি হয়ে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারলেসে খবর চলে গেল মেক্সিকোয় আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই একটা হেলিকপ্টার এসে এমার্সনকে তুলে নিয়ে গেল বড় হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য।

এমার্সনের সঙ্গে অমিতেশের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, তাই সে রাতটা আর ঘুমোতে পারল না। শেষ রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল টের পেল।

সকালে রোদ উঠতেই ভাবল একবার বাগানে পায়চারী করে আসি। কিন্তু দু'পা যেতেই চোখে যা পড়ল তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ! সারা বাগানের মধ্যে দিয়ে ঝড়—না ঝড় না, অগ্নিকাণ্ডের মত কিছু একটা বয়ে গেছে। ফুলগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, প্রত্যেকটি গাছের ডালপালা তুবড়ে, ভেঙ্গে নেতিয়ে পড়েছে। একটা গাছও আর স্বাভাবিক নেই।

যতই এগোচ্ছে ততই যেন দৃশ্য ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক রাতের মধ্যে এত বড় ধ্বংসলীলা কি করে সম্ভব? মনে একটা সন্দেহ জাগছিল। তাই অমিতেশ তখনই ছুটলো ডক্টর বোস্কিমুরার কাছে।

সব শুনে তিনি বললেন, "আমিও এই রকমই আশঙ্কা করছিলাম। ঐ যে ভারী পাথরের টুকরো দু'টো—ও দু'টো দেখেই আমার মনে হয়েছিল ওগুলো পৃথিবীর ওপরকার কোন পাথর নয়, হয়তো আকাশের কোন অজানা গ্রহ বা গ্রহানু থেকে ছিটকে পড়া জ্বলন্ত উল্কার ভগ্নাবশেষ। ওর মধ্যে তো লোহাই বেশি থাকে, তাই পাথরের চেয়েও ভারী তো হবেই! এই সব অজানা গ্রহ বা গ্রহাণুতে কি আছে আমরা সঠিক জানি না। কোন অজানা জীবানু বা তার চেয়েও ছোট ভাইরাস থাকাও বিচিত্র নয়। এই ভাইরাসের আশঙ্কা করেই আমি পাথরটিকে হাত দিয়ে ধরতে বারে বারে নিষেধ করেছিলাম। ভাইরাস জীবাণুর তুলনায় অনেক ছোট। এত ছোট যে সাধারণ শক্তিশালী মাইক্রস-কোপেও ওদের দেখা যায় না, অথচ কতকগুলো মারাত্মক, এমন কি সাধারণ রোগের এরাই যে

কারণ তা জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে এন্‌কেফেলাইটিস, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, এমন কি সর্দিকাসিও! আর তারই জন্য এই ভাইরাসকে এখনও বিজ্ঞানীরা আয়ত্তে আনতে পারেন নি।"

অমিতেশ বলল, "তা হলে ইলেক্‌ট্রন মাইক্রস্‌-কোপে যে স্ফটিকের মত দানা দেখা গিয়েছিল সেগুলিই কি ভাইরাস?"

"ঠিক ধরেছেন, এই ভাইরাসকে এখন বিজ্ঞানীরা জড় আর জীবের মাঝখানকার মিসিং—লিঙ্ক বলে মনে করছেন। কোন সজীব পদার্থ কখনও স্ফটিকের মত দানা বেঁধে থাকে বলে আমাদের জানা নেই। কাজেই এই ভাইরাসগুলো যতক্ষণ দানা বেঁধে থাকে ততক্ষণ তারা জড় পদার্থ ছাড়া কিছু নয়। সাধারণ জীবাণুকে আমরা চাষ করে—অর্থাৎ কাল্‌চার করে তার বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারি, এবং করছিও। কিন্তু ভাইরাসগুলোকে ঐ ভাবে চাষ করা কখনই সম্ভব নয়। যদি একবার ওরা কোন জ্যান্ত দেহকোষ —তা মানুষেরই হোক বা আর কোন জন্তুরই হোক বা গাছপালারই হোক, সংস্পর্শে আসতে পারে তখনই এরা জড় থেকে জীবে পরিণত হবে আর সেই দেহকোষের মধ্যেই অতি দ্রুত বংশ বিস্তার করতে শুরু করবে। ঐ অজানা গ্রহ বা গ্রহাণুর মধ্যে যে মারাত্মক ভাইরাস জড় অবস্থায় ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে সজীব দেহকোষের স্পর্শে এসে কী ভয়ানক কাণ্ড করেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এমার্সনকে ওরা প্রথম আক্রমণ করে। আমার ধারণা, ওদের আরও কিছু কিছু টুকরো হয়তো জঙ্গলে, বাগানে পড়ে ছিল, বৃষ্টি এসে আরও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করায় ওরা এইটুকু সময়ে গাছপালার মধ্যেও এই প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়েছে। যাই হোক ঐ মারাত্মক গ্রহান্তরের কণা আর কোথাও পড়েছে কিনা সেটা খুঁজে বার করাই আপাততঃ হবে আমাদের প্রথম কাজ। তার পর কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় ভেবে দেখব।"—বলে ডক্টর বোস্কিমুরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। অমিতেশ শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

গান শুনতে গাছও ভালবাসে !

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে। সোনালী রোদ এসে পড়েছে ধানের ক্ষেতে। কাছে পিঠে জন-মানব নেই, তবু ৩ মিটার দূরে একটি বাঁশের ডগায় বাঁধা লাউড-স্পিকারে বেজে চলেছে বেহালায় 'তাড়ী' রাগিণীর আলাপ। অবশ্য একেবারে যে ঐ যন্ত্র-সঙ্গীতের শ্রোতার অভাব আছে তা বলা যায় না। শ্রোতা কয়েক হাজার তরুণ। তাদের কাজ নেই, নড়া চড়া করারও শক্তি নেই তবে প্রাণ আছে। তারা সারা অঙ্গ দিয়ে উপভোগ করছিল ঐ বাজনা। এসব কথা তোমাদের কাছে হয়ত হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে। তাই খুলে বলি। আসলে গান শোনানো হচ্ছিল বাড়ন্ত ধানের চারাকে। ঐভাবে নিয়মিতই তাদের গান শুনিয়ে আসছেন ভারতীর বিজ্ঞানী টি,-এন,-সিং; তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন—গাছ গান-বাজনা শুনতে ভালবাসে। যদি সূর্যোদয়ের আধঘণ্টা পরে বেহালা কি বাঁশিতে বিশেষ বিশেষ রাগ রাগিণী বাজিয়ে শোনানো যায় তবে তাদের ফলন ভালো হয়—উৎপাদন বাড়ে; তবে ঐ বাজনা বা গান অল্প সময়ের জন্যেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজালেই সুফল মেলে। হিন্দুস্থানী, কর্ণাটকী বা পাশ্চাত্য সব রকম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে শ্রী সিং ৯টি রেকর্ড বাছাই করে নেন। যেসব চারাকে গান বাজনা শোনানো হয় দেখা গেল তারা অন্যান্য গাছের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। আবার সারা দিন একটানা গান বাজিয়ে দেখা গেছে গাছের চারাগুলো ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে। গাছের বৃদ্ধির ওপর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শ্রীসিং-এর গবেষণা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগিয়েছে। তিনি বলেছেন—আলো-হাওয়া-তাপের মত সুরেলা ধ্বনি তরঙ্গও গাছের বৃদ্ধির একান্ত সহায়ক। সারা দুনিয়ায় এখন ঐ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। শ্রী সিং পণ্ডিচেরির কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ভোরবেলা, বাছাই করা কয়েকটি গাছের ওপর, বেছে নেওয়া বিশেষ কয়েকটি রাগের রেকর্ড বাজিয়ে বিশেষ সুফল পেয়েছেন। যেমন, একবার বাছাই করে রাখা কিছু ধানের চারাকে শোনানো হল বাঁশিতে 'চারুকেশী' রাগিনীর আলাপ; কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল অন্যত্র রোপণ করা ধানের চারার তুলনায় গান শুনতে অভ্যস্ত ধানের চারাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ২৮ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গেছে!' আবার বেহালায় বাজানো তোড়ীর আলাপ শুনে ট্যাপিওকা গাছ স্বাভাবিকের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে। চীনা বাদাম, তামাক বা আখের ক্ষেত্রেও মার্গসঙ্গীত এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

ক্ষেতের ১৫ মিটারের মধ্যে ঐ বাজনা বাজালেই হল। শুধু দেখতে হবে সেটা বেসুরো-বেতালা না হয়।

গাছগুলোর ওপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে মার্কিন দেশের কেন্টাকিতে, কানাডার অন্টারিও-তে এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও একই সময়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। ও দেশেও তামাকের ও চীনা বাদামের ফলন বাড়ানো গেছে বেহালা; সরোদ বা বাঁশিতে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে। বর্তমানে সবজীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে মার্কিন দেশে তো একটি এল-পি-রেকর্ডই বেরিয়ে গেছে; যার নাম Music to grow plants by!

অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী শ্রী সিং প্রথম যখন জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলার ওপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেছিলেন তখন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের কৃষি বিজ্ঞানীরা ঐ বিষয়ে ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। পাঁচ সপ্তাহের পরীক্ষায় শ্রী সিং প্রমাণ করে দেন যে যন্ত্রসঙ্গীত হাইড্রিলার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এতকাল পশুপাখির ওপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রাণী-বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বিংশ শতকের সত্তরের দশকে গাছপালার উৎপাদন বাড়াতে গানবাজনা এমনকি নৃত্যের ভূমিকা নিয়ে নানা মহাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রায় একযোগেই নানা পরীক্ষা শুরু করেন। যেমন আমেরিকার বিজ্ঞানী মিনস্টাইন বলেছেন—সুনির্দিষ্ট সময়ে বাজানো সুরেলা গান বাজনা উপভোগের জন্যে গাছের পাতার গায়ে যে ছিদ্রগুলো রয়েছে তা ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও বেশি সময় ধরে তা খোলা থাকে। ঐ প্রসারণের ফলে গাছ আলো-হাওয়া বেশি করে পায়। উৎপাদনও বাড়ে। বিজ্ঞানী স্মিথ মনে করেন, সুমিষ্ট ধ্বনি তরঙ্গ মাটির আণবিক গঠনের ওপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা মাটির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে মাটিতে বাসা বেঁধে থাকা জীবাণুদের কার্য-কলাপও বদলে যায়। ঐ জীবাণুরা আবার গাছের দ্রুত বৃদ্ধির সহায়ক।

অধ্যাপক সিং বলছেন, মার্গ সঙ্গীতের সুরলহরী যে ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা গাছের প্রতিটি কোষের ভেতরে প্রোটোপ্লাজমকে এক ধরণের হরমোন ক্ষরণে সাহায্য করে, তার ফলে মাটি থেকে গাছের পুষ্টি গ্রহণের ক্ষমতাও বেড়ে যায়। বাড়ে উৎপাদন ক্ষমতা। কানাডার বিজ্ঞানী ডঃ উইন বারগার অন্টারিওতে পরীক্ষা চালিয়ে শ্রী সিং-এর মত একই ফল পেয়েছেন। তবে তাঁর মতে, যেকোন রকমের ধ্বনি তরঙ্গই গাছের কোষের পাতলা ঝিল্লির মধ্যে দিয়ে জল অনুপ্রবেশের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আর এই ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে মাটি থেকে বেশি পরিমাণে ফস্‌ফরাস গাছ গ্রহণ করতে পারে। আর তা চটপট বেড়ে ওঠে।

কিন্তু মার্কিন বিজ্ঞানী শ্রীমতী ডরোথি রেটল্যাণ্ড ডেনভার কৃষি গবেষণাগারে পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে বেসুরো, এলোমেলো বাজনা বা কোলাহল গাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মোটেই সহায়ক নয়—বরং প্রতিকূল। বেশিক্ষণ ধরে রক মিউজিক শোনানোর পর কয়েকটি চীনা বাদামের চারা অকালে শুকিয়ে যায়। চড়া সুরের বাজনা গাছের ওপরেও অনেকটা স্নায়বিক চাপের মতনই চাপ সৃষ্টি করে। গাছ-সুর রসিক। এমনকি নৃত্য রসিকও বটে!

শ্রী সিং দেখেছেন গাঁদা বা ডেজি জাতীয় মরসুমী ফুলের বাগানের চারপাশে ভারতনাট্যম নাচ নাচার পর ঐ সব ফুলের চারার উৎপাদন অনেকটা বেড়ে গেছে। রোজ বিকেলে আধ ঘণ্টা করে কয়েকটি মেয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঐ নাচ নাচতো। সম্ভবতঃ মাটিতে তালে তালে পা ফেলার ফলে যে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হয় সেটার সঙ্গে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কোন যোগ আছে। ঐ বিষয়ে অবশ্য এখনও গবেষণা চলছে।

With best compliments from

Sm. Bani Paul.
Sm. Krishna Hazra.
Sri S. N. Sarkar.

যা বৃষ্টি চলে যা

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

'আরে, ওই তো ও আবার এসেছে'—যত্ন করে জানলার খড়খড়ি ঠিক করতে করতে লিলিয়ান রাইট বলে উঠল, 'দেখো জর্জ, ওই তো ও ওখানে!' 'ওখানে কে?' লিলিয়ানের স্বামী টিভিতে আলো ঠিক করার চেষ্টা করছিল, যাতে বেস-বল খেলাটার মধ্যে একেবারে ডুবে যেতে পারে। সেই ভাবেই প্রশ্নটা করল।

'স্যাক্কারো গিন্নি।' কথাটা বলেই সে যেন বুঝতে পারল, তার স্বামী এবার বলবে—সে আবার কে? তাই সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে দিল—'আমাদের নতুন পড়শী গো, বুঝতে পারছো না?'

'ও!'

'রোদ্দুরে পুড়ছে। সবসময়েই রোদ্দুরে পড়ে আছে। কে জানে ওর ছেলেটা কোথায়! এরকম চমৎকার দিন হলেই তো সেটা বাইরে আসে। ওদের সামনেটায় তো প্রচুর জায়গা—সেখান থেকে বাড়িটার গায়ে বল ছুঁড়ে মারে। তুমি ওকে কখনো দেখনি জর্জ?'

'না, তবে শুনেছি। একেবারে চীনেদের জল দিয়ে অত্যাচার করার শব্দ! দেয়ালে দুম করে একটা আওয়াজ, ধপাস করে মেঝেতে, তারপরই চাপড়। এই চলছে হরদম—দুম—ধপাস—চাপড়, দুম—ধপাস'—

'থামো তো! ছেলেটা কিন্তু বেশ ভাল—শান্ত-শিষ্ট, ব্যবহার-ট্যবহারও বেশ। টমি ওর সঙ্গে ভাব করলে দারুণ হতো, বয়সটাও তো প্রায় কাছাকাছি দশ-টশের বেশী কখনোই হবে না।'

'আলাপ জমাতে টমি খুব পিছপা বলে তো

আমি জানতাম না !'

'স্যাঙ্কারোদের সঙ্গে ভাব করা বাপু বেশ শক্ত ব্যাপার—এমন গুটিয়ে রাখে নিজেদের ! কর্তাটি যে কি করে জানতে পারলাম না এখনো।'

'জেনে তোমার কি লাভ ? তিনি কি করেন না করেন তা নিয়ে কারো মাথা ঘামাবার দরকার কি ?'

'কখনোই তো ওকে কোন কাজকর্মে বেরুতে দেখি না—বিচ্ছিরি লাগে না ?'

'আমাকেও তো কেউ কখনও কাজেটাজে বেরুতে দেখে না !'

'তুমি তো বসে বসে লেখো। ও কি করে ?'

'আমার মনে হয় স্যাঙ্কারো গিন্নিও হয়ত জানেন না তাঁর স্বামী কি কাজ করেন—অথচ আমি কি করি সেই ভেবেই বোধহয় তিনি ছটফট করছেন !'

'আঃ, জর্জ !' জানলা থেকে সরে এসে লিলিয়ান একবার বিরক্ত মুখে দূরে টেলিভিশনের দিকে তাকাল। (শোয়েনভিয়েন তখন ব্যাট করছে।) বলল, 'আমার মনে হয় একটু চেষ্টা করা উচিত—পাড়া-পড়শী বলে কথা !'

'কি রকম চেষ্টা বলো তো ?' সোফায় বেশ জমিয়ে বসে জর্জ জিজ্ঞাসা করল।

'ওদের পরিচয় জানতে চেষ্টা করা আর কি !'

'জানতে পারোনি ? ওরা যখন প্রথম এলো তুমি তো গিয়েছিলে বললে !'

'না মানে, তখন তো সবে এসেছে—বাড়িটাড়ি সব অগোছালো—আমি বললাম, 'ভাল তো ?' ওই সেই পর্যন্তই। তারপর দু-দুটো মাস কেটে গেল—অথচ সেই 'ভাল তো' থেকে আলাপ আর এগুলো না ! বউটা অদ্ভুত ধরণের।'

'তাই নাকি ?'

'সব সময় দেখো, আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ! একশোবার সেই একইভাবে দেখছি। একটুখানি মেঘটেঘ জমার সম্ভাবনা হল তো ব্যাস, আর বেরোবেই না বাইরে ! একবার কি হল—বাচ্চারা বাইরে খেলছে—ভেতর থেকে কি চীৎকার, বৃষ্টি হবে, এক্ষুণি ভেতরে চলে আয় ! আমি অবশ্য বাড়ির মধ্যে থেকেই ওর চীৎকারটা শুনলাম। ভাবলাম, হায় ভগবান, এ সময়েই কিনা আমি একগাছা কাচাকাচি নিয়ে বসলাম ! তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। ওমা, রোদ্দুরে একেবারে ফটফট করছে। একটু-আধটু মেঘ অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা কিছুই নয়।'

'বৃষ্টি কি হল শেষ পর্যন্ত ?'

'মোটেই না। মিছিমিছিই দৌড়োদৌড়ি করে বাইরে এলাম।'

জর্জের মন চলে গিয়েছিল বেস-বলের কতকগুলো মারের দিকে। বিশ্রী ফিল্ডিং—একটা রান হবেই হবে। উত্তেজনা যখন অনেকটা কমে এসেছে, যিনি বল করছেন তিনি যখন বেশ খানিকটা শান্ত, জর্জ চেঁচিয়ে লিলিয়ানকে ডাকল। লিলিয়ান রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পেরে বলল—'ওঁরা তো এরিজোনার লোক—তাই মনে করেন সব মেঘেই বুঝি বৃষ্টি হয়।'

চটির পটর পটর শব্দ করতে করতে শোবার ঘরে ফিরে এল লিলিয়ান, বলল, 'কোথাকার লোক বললে ?'

'এরিজোনার। মানে, টমি যা বলল আর কি।'

'টমি কি করে জানল ?'

'ওদের বাচ্চাটার বল খেলার ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিল বোধহয়। ও-ই টমিকে বলেছিল, ওরা এরিজোনা থেকে এসেছে। তারপরই নাকি বাচ্চাটা ভেতরে চলে যায়। মানে, টমি

বলছে আর কি ওই রকমই নাম—এরিজোনা হতে পারে, এলাবামা হতে পারে—এইরকম ধরণের অন্য কিছুও হতে পারে। টমিকে তো জান, পুরোটা ও কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। তবে ওরা আব-হাওয়ার ব্যাপারে এত ভীতু যে আমার মনে হয় ওরা এরিজোনারই লোক—নইলে এখানে বর্ষাকালটা যে এত সুন্দর সেটা ওরা জানবে না কেন?'

'এ কথা তুমি আমায় কখনো বলোনি তো?'

'আরে টমিতো আজ সকালেই আমাকে বলল—মনে করেছিলাম, তোমাকে কি আর একথা ও বলেনি! তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, কিছু জানতে না পারলেও ভেবেছিলাম তুমি ঠিক টেনে-টুনে একটা কিছু বানিয়ে নেবেই, মানে মেয়েরা'—

বলটা উড়ে গিয়ে পড়ল একেবারে মাঠের ডান দিকে দর্শকদের আসনে। ওঃ—বল করছিল যে লোকটা, এতক্ষণে একেবারে ঠিক শাস্তি পেয়েছে।

লিলিয়ান ফিরে গেল ফের সেই খড়খড়ির কাছে। বলল, 'বউটার সঙ্গে আলাপ আমায় করতেই হচ্ছে। সত্যি, বউটা দেখতে কিন্তু দারুণ। আরে এই তো দেখো জর্জ'—

জর্জ এখন টিভি ছাড়া আর কিচ্ছু দেখছে না।

লিলিয়ান বলল, 'বউটা এখন হাঁ করে তাকিয়ে মেঘ দেখছে। এখুনি ভাল মানুষের মতো ঘরে ঢুকে গেল আর কি!'

●

দিন দুয়েক পরে লাইব্রেরীতে কয়েকটা দরকারী তথ্য খুঁজতে একটু বেরিয়েছিল জর্জ। একগাদা বইপত্তর নিয়ে ফিরতেই লিলিয়ান বেশ হাসিখুশী মুখে এগিয়ে এল, বলল—'শোন, কাল কিন্তু তুমি কিচ্ছু করবে না।'

'এটা তো ঠিক প্রশ্নের মত শোনাচ্ছে না, এ তো হুকুম।'

'হ্যাঁ, তাই। আমরা কাল স্যাকারোদের সঙ্গে মার্ফি পার্কে যাচ্ছি।'

'কার সঙ্গে?'

'আমাদের পাশের বাড়ির পড়শীদের সঙ্গে। তোমার নাম টাম কেন মনে থাকে না বলো তো জর্জ?'

'ঈশ্বরের আশীর্বাদ। যাকগে, এমন কাণ্ড হলো কি করে?'

'আজ সকালে সোজা ওদের বাড়ি চলে গিয়ে কলিং বেল টিপলাম!'

'এতো সহজে?'

'অতোটা সহজে অবশ্য নয়, একটু ঝামেলা হয়েছিল। বার বার বেলে আঙুল টিপে দাঁড়িয়েই আছি—শেষটা মনে হচ্ছিল দুয়োর খুলে কেউ আমায় বোকার মত এইরকম দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার চেয়ে এইভাবে বেল টিপে যাওয়াটাই আমার পক্ষে ভাল।'

'গিন্নি তোমায় তাড়িয়ে টাড়িয়ে দেয়নি তো!'

'মোটেই না। বউটি যা মিষ্টি কি বলব—ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল, আমার পরিচয় জেনে নিল, বলল আমি আসায় নাকি দারুণ খুশী হয়েছে। ভাবতে পারো?'

'হ্যাঁ, ভাবলাম কি জানো, বাচ্চারা মজা পাবে এইরকম একটা কিছু প্রস্তাব দিলে ওর পক্ষে মেনে নেওয়াটা সহজ হবে। বাচ্চার পক্ষে আনন্দ করার একটা সুযোগ কি ও চট করে নষ্ট করবে!'

'একেবারে মায়ের মনের কথা!'

'আঃ, ওদের বাড়িটা যদি একবার দেখতে!'

'শোন, শোন। তোমার এসব করার একটা কারণ আছে—তোমাদের এসব মনে হবেই।

ক্যাপ্টেন কুকের মত তুমি একটা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলে। কিন্তু দোহাই তোমার—ওদের বাড়ির সাজসজ্জার ব্যাপারটা থেকে আমায় রেহাই দাও। ওদের খাট-পালঙ্ক সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই, কিংবা ধরো ওদের আলমারিটা কত বড় না জানলেও আমার দিব্যি চলে যাবে।'

কিন্তু বললে কি হয়, লিলিয়ান তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে চলেছে ও বাড়ির রঙচঙে ছবির কথা, খাট-বিছানার পরিপাট্যের কথা—এমন কি আলমারির বর্ণনাও চলেছে একেবারে তিল তিল করে।

'আর কি পরিষ্কার! ওরকম ঝকঝকে জিনিষপত্র আমি কোথাও দেখিনি।'

'তুমি তো ওর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলে, তাই এমন জিনিষ তোমায় দেখিয়েছিল, যার কাছাকাছি পৌঁছবার ক্ষমতা তোমার নেই। তখন নিজে থেকেই তাকে এড়িয়ে যাবার কথা যাতে তোমার মনে হয়।'

'আহা কি রান্নাঘর'—জর্জের কথা উড়িয়ে দিয়ে লিলিয়ান বলতে লাগল, 'এমন চকচক করছে যে তুমি বিশ্বাসই করবে না যে ওরা কখনো সে ঘর বাবহার করেছে। আমি এক গ্লাস জল খেতে চাইলাম। গিন্নি কি করলে, এমন ভাবে ট্যাপের নীচে গ্লাসটা ধরল আর এমন সাবধানে আস্তে আস্তে জল ভরতে লাগল যাতে একটি জলের ফোঁটাও সিঙ্কে পড়তে না পারে। ওটা যে ভান করে করেছে তা কিন্তু নয়, এমন ভাবে কাজটা করছিল যে আমি বুঝতে পারলাম, ও বরাবর ওইভাবেই জল ভরে। তারপর করলে কি একটা পরিষ্কার চাদরে ধরে গ্লাসটা আমায় এগিয়ে দিল। একেবারে স্বাস্থ্যের নিয়ম মানা কাজ!'

'ভদ্রমহিলার কপালে কষ্ট আছে দেখছি। উনি কি আমাদের সঙ্গে যেতে একেবারে এককথায় রাজী হয়ে গেলেন?'

'না ঠিক এককথায় নয়—কথা শুনে ও কর্তার কাছে গেল, আবহাওয়ার পূর্বাভাস কি জানতে চাইল! ওর কর্তা ওকে বলল, সব কটা কাগজেই লিখেছে কাল আবহাওয়া বেশ ভালই থাকবে—অবশ্য সেইসঙ্গে এও বলল যে, আবহাওয়ার সবশেষ খবর শোনার জন্য যে নাকি রেডিওর কাছে বসে আছে।'

'সব খবরের কাগজেই এককথা বলেছে? ছি ছি।'

'নিশ্চয়ই বলবে! সব কাগজই তো আবহাওয়ার পূর্বাভাসের সরকারী বিজ্ঞপ্তি ছাপায়! তারা একমত হবে না কেন? কিন্তু আমি ভাবছি, প্রত্যেকটা খবরের কাগজই ওরা নেয়? হ্যাঁ, তাইতো—কাগজ দেওয়া ছোঁড়াটা যেরকম একখানা তাড়া এগিয়ে দেয় ওদের বাড়িতে—'

'তোমার চোখে বিশেষ কিছুই এড়ায় না—কি বলো?'

'যাকগে'—বিষদৃষ্টি হেনে লিলিয়ান বলল, 'গিন্নি আবহাওয়া দপ্তরে ফোন করল, আবহাওয়ার সবশেষ পরিস্থিতি জেনে নিল, কর্তাকে জানিয়ে দিল সে কথা। তারপর শেষমেষ যাবার ব্যাপারে রাজী হয়ে গেল। অবশ্য বলল, আবহাওয়ার যদি হঠাৎ অদল বদল কিছু হয়ে যায় তাহলে আমাদের ফোনে জানিয়ে দেবে।'

'চমৎকার। তাহলে আমরা যাচ্ছি!'

●

স্যাকারোদের দম্পতি বেশ অল্প বয়সী, দেখতেও বেশ চমৎকার। তাদের বাড়ি থেকে রাইটদের গাড়ি যেখানে দাঁড় করানো ছিল, বেশ খানিকটা

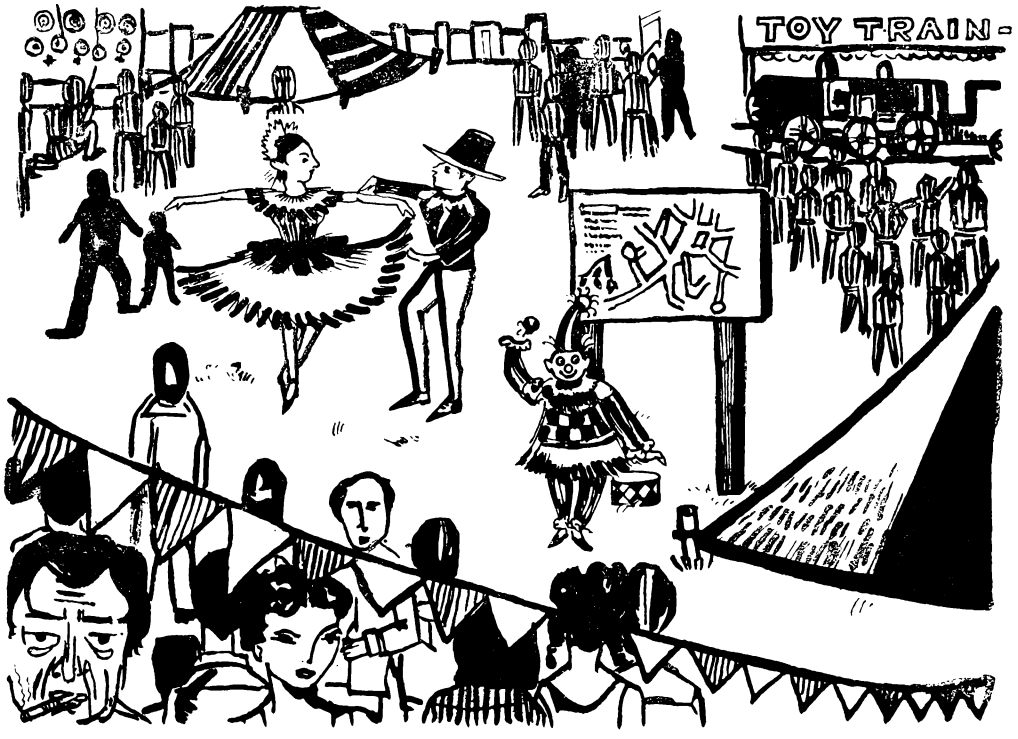

মার্ফি পার্কের এই দিনটি ছিল বড় চমৎকার।...

রাস্তা। যখন তাঁরা আসছিল, জর্জ তার স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওঁর জন্যেই তোমার এত কৌতূহল!'

'বেশ, তাই'—লিলিয়ান বলল, 'লোকটা একটা হাতব্যাগ বয়ে নিয়ে আসছে কেন?'

'ওতে একটা পকেট-রেডিও আছে—আবহাওয়ার খবর শোনার জন্যে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

স্যাক্কারোদের বাচ্চা ছেলেটি ওদের ঠিক পেছনেই দৌড়তে দৌড়তে এলো। তার হাতে যে জিনিষটা দুলছিল, বোঝা গেল সেটা একটা অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার। ওরা তিনজনেই বসল গিয়ে গাড়ির পেছনের সীটে। আলাপ-সালাপ শুরু হয়ে গেল —চললোও মার্ফিপার্ক পর্যন্ত। কিন্তু সবই বড় সংক্ষিপ্ত। ব্যাক্তিগত আলাপ নয়, অন্যান্য সব টুকিটাকি কথা।

স্যাক্কারোদের ছেলেটি এমনই নরমসরম আর চুপচাপ যে বেচারা টমি রাইট পর্যন্ত একটু পরেই বাবা-মার মাঝখানে গিয়ে সামনের সীটে চুপটি করে বসে রইল। ওদের বাচ্চার এতখানি ভব্যতা দেখে বেচারী একেবারে মুষড়ে পড়ল। লিলিয়ানও জীবনে কখনো এতটা মুখ বুজে শান্তশিষ্টের মতো কোথাও বেড়াতে গিয়েছে বলে তার মনে পড়লো না। অবশ্য মিঃ স্যাক্কারো যে তাদের কথাবার্তার মাঝেই প্রায় শুনতে না পাওয়ার মত আস্তে রেডিওটা চালিয়ে রেখেছিল, তাতে লিলিয়ান বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। সে যে প্রায়ই রেডিওটা কানের কাছে নিয়ে যাচ্ছে তাও

ও দেখেনি।

মার্ফি পার্কের এই দিনটি ছিল বড় চমৎকার। শুকনো খটখটে উষ্ণ দিন। বেশী গরম নেই, ওপরে নীলে নীল আকাশ—চারিদিক উজ্জ্বল রোদ্দুরে চনমনে। মিঃ স্যাক্কারো যদিও আকাশের চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ব্যারোমিটারের দিকে—কিন্তু তারও খুঁত খুঁত করার মত কিছু রইল না।

লিলিয়ান বাচ্চা দুটিকে শিশুদের মজার বিভাগে নিয়ে গেল। সেখানে যত রকমের হৈ-হল্লা করবার বন্দোবস্ত আছে প্রত্যেকটিতে যাতে তারা দুজন অংশ নিতে পায় সেই রকম টিকিট কেটে দিল। খাবার আগে ও বলেছিল—'শুনুন, এবারকার বেড়ানোটা কিন্তু সবটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন—পরের বার না হয় আপনারাই খরচ-খরচা করবেন।' স্যাক্কারো-গিন্নি আপত্তি করেছিল, ও শোনেনি।

ফিরে এসে জর্জকে একা দেখে ও বলল—ওরা কোথায়? আমি যে'···'ওই তো নীচে জলখাবারের জায়গায়। আমি ওদের বললাম, তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো—তুমি এলে আমরা ওদের কাছে যাবো।'

'কি হয়েছে বলো তো?'

'হবে আবার কি! আমার মনে হয় ওঁরা এত বড়লোক যে এসব খেয়ালই করেন না।'

'বাজে বকো না তো!'

'উনি এরিজোনার লোকও নন কিন্তু।'

'নয় নাকি?'

'আমি যখন বললাম আমি শুনেছি তিনি এরিজোনা থেকে এসেছেন, এমন আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন যে তাতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেল। তারপর হেসে বললেন, আমার কথায় এরিজোনার টান পাচ্ছেন নাকি?'

'লিলিয়ান কি যেন একটা ভাবতে ভাবতে বললে, 'ওর কথায় কিন্তু সত্যিই একটা অদ্ভুত টান আছে, জানো! দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক লোক আছে, যাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে স্পেনীয়। সেই ভাবেও তারা এরিজোনার লোক হতে পরে। স্যাক্কারো তো স্পেনীয়দের নাম হয়!

আমার কাছে ওটা জাপানী নাম। এসো এসো, ওই দেখো ওঁরা হাত নাড়ছেন। হায় ভগবান, ওঁরা কি কিনেছেন দেখো!'

স্যাক্কারো-দম্পতির প্রত্যেকের হাতেই তিনটে করে সেই জিনিষ, বাচ্চারা যাকে বলে 'বুড়ির চুল'। ওগুলো তৈরী হয় চিনিগোলা জল থেকে। এই চিনির জল একটা উষ্ণ পাত্রে জোরে ঘোরালে তার গায়ে চিনির সুতো দিয়ে তৈরী যে গোলাপী ফেনা পাত্রের মধ্যে জমে যেতে থাকে—নরম নরম গোলাপী সেই তুলোর মত জিনিষই কাঠির ওপর রাখা হয়। মুখে দিলেই চটপট গলে যায় আর সারা মুখ চট চট করে।

স্যাক্কারোরা সেই বস্তুই একটি করে বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে। ভদ্রতা করে বেচারী রাইটদের নিতেই হল বাধ্য হয়ে।

পার্কের ভেতরে ওরা ঘুরতে লাগল। হাতের টিপ পরীক্ষা করার খেলা খেলল, বল গড়িয়ে গর্তের মধ্যে ফেলা যায় কিনা সে চেষ্টা করল, বোর্ডে আঁটা কাঠের নল ধাক্কা মারার খেলাও বাদ গেল না। অনেক ছবি টবি তুলল ওরা, নিজেদের গলার স্বর টেপ্ করল, হাতের কব্জির জোরও পরীক্ষা করল একবার।

শেষ পর্যন্ত ওরা বাচ্চাদের নিয়ে আসতে গেল। বেচারীরা তখন ভেতরে দৌড়োদৌড়ি করতে করতে

একেবারে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। স্যাক্কারো কর্তা-গিন্নি ওদের জলখাবারের জায়গায় নিয়ে গেল। টমি তার জন্যে মাংসর রোল কেনা হবে ভেবে আহ্লাদে আটখানা। জর্জ তাকে পয়সা দিতেই সে এক ছুটে সেখানে চলে গেল।

'আর ওখানে গিয়ে কাজ নেই'—জর্জ বলল, 'সত্যি বলছি,। আমার এখানে থাকাই ভাল। ফের যদি দেখি ওঁরা আবার একখানা করে ওই বুড়ির চুল গিলতে শুরু করেছেন আমি ঘাবড়ে গিয়ে ওইখানেই অসুস্থ হয়ে পড়বো।'

'আমি ওখানে মিঃ স্যাক্কারোকে একটু আঙ্গুরের রস খেতে অনুরোধ করেছিলাম। তাতে কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে উনি ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। একটু আঙ্গুরের রস অবশ্য এমন কিছু নয়, কিন্তু অত চিনির ডেলা খাওয়ার পর ওটা ভালই লাগবে মনে হয়েছিল।'

'বুঝতে পারছি। গিন্নিটিকে আমি এগিয়ে দিয়েছিলাম এক গ্লাস কমলালেবুর রস। তাতে না না করে আঁৎকে উঠে এমন একখানা লাফ মারল যে দেখলে তুমি মনে করতে গ্লাসশুদ্ধ যেন ওর মুখে আমি ছুঁড়ে মেরেছি। আশ্চর্য!' কিন্তু দেখ লিলি'—দিকে এগুতে এগুতে জর্জ বলল, 'একটু কিন্তু মেঘ করেছে।'

মিঃ স্যাক্কারো ততক্ষণে রেডিওটা কানে চেপে ধরেছে, উদ্বিগ্নভাবে তাকাচ্ছে পশ্চিম আকাশের দিকে।

'আঃ হা—দেখেছো'—জর্জ বলে উঠল, 'ঠিক দেখেছেন। বাজি ফেলে বলতে পারি উনি এবার বাড়ি ফিরে যেতে চাইবেন।'

স্যাক্কারোরা তিনজনেই ততক্ষণে এসে গেছে জর্জের কাছে। খুব ভদ্রভাবেই বলল কথাটা, কিন্তু বোঝা গেল তারা নাছোড়বান্দা। তারা যে অদ্ভুত চমৎকার কাটিয়েছে সময়টা, সে কথা স্বীকার করল, রাইটদেরও তারা নিমন্ত্রণ করবে সময় সুযোগ হলেই—সে কথাও বলল। কিন্তু তারা ভীষণ দুঃখিত এখন তাদের বাড়ি ফিরে যেতেই হবে। ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে—মিঃ স্যাক্কারো হতাশভাবে জানাল, 'আবহাওয়ার সব পূর্বাভাষই একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল।'

জর্জ অনেকরকম করে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছিল—'এরকম স্থানীয় ঝড়টড়ের কথা আগে থেকে বলা যায় না। নাই আসুক, ঝড় যদি আসেই—আধ ঘণ্টার বেশী তা কখনোই চলবে না।'

কথা শুনে স্যাক্কারোদের ছেলেটির প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা। স্যাক্কারো-গিন্নি হাতে রুমাল নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

হাল ছেড়ে দিয়ে জর্জ বলল, 'ঠিক আছে বাড়িই ফেরা যাক।'

●

ফেরার পথটা মনে হচ্ছিল যেন আর শেষ হতেই চায় না। কারোর মুখে কোন কথা নেই। মিঃ স্যাক্কারোর হাতের রেডিও এখন গাঁক গাঁক করে বাজছে। সে এক সেণ্টার থেকে আর এক সেণ্টারে কাঁটা ঘুরিয়ে কেবলই আবহাওয়ার খবর শুনছে। রেডিওতে এখন স্থানীয় ঝড় জলের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। ওদের বাচ্চাটি দেখাচ্ছে, ব্যারোমিটার কাঁটা নীচে নামছে। স্যাক্কারোর গিন্নি হাতের ওপর চিবুক রেখে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে আর জর্জকে বলেছে—'আর একটু জোরে চালান।'

'এমন কিছু ভয়ের ব্যাপার কিন্তু মনে হচ্ছে না—হচ্ছে কি?' লিলিয়ান ঠাণ্ডাভাবে ওদের মন থেকে

যেন ভয় দূর করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জর্জ শুনতে পেল ও কানের কাছে ফিস ফিস করছে—'জোরেই চলো বাপু।'

সামনের রাস্তার ধূলো উড়িয়ে এবার বাতাস উঠল। গাড়িও অবশ্য তাদের বাড়ি যে রাস্তায়, সেই রাস্তায় এসে পড়েছিল। রাস্তায় শুকনো পাতা উড়ে বেড়াচ্ছিল। একবার বিদ্যুতও ঝলসে উঠল।

জর্জ বলল, 'আর দুমিনিটের মধ্যেই আমরা বাড়িতে ঢুকে যাবো—সে ব্যবস্থা আমি করছি।'

স্যাক্কারোদের বাড়ির সামনে যে বিরাট খোলা জায়গা, তার ফটকে এসে জর্জ গাড়ি থামাল। পেছনের দরজা খুলবার জন্য গাড়ি থেকে নামল। মনে হল এক ফোঁটা জল তার গায়ে পড়ল। ওঃ একেবারে ঠিক সময়েই পৌঁছনো গেছে।

স্যাক্কারোরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। আতঙ্কে তাদের মুখ ফ্যাকাশে। কোনরকমে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই বিশাল খোলা জায়গা দিয়ে তারা প্রাণপণে দৌড়তে লাগল।

'সত্যি'—লিলিয়ান বলছিল, 'ওরা যে কি না'—

আকাশ যেন ফাঁক হয়ে গেল। যেন কোন অন্তরীক্ষের বাঁধ হঠাৎ ধ্বসে গেছে, এইভাবে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা চড়বড় করে নেমে এলো মাটিতে। গাড়ির ওপরে বৃষ্টির তাণ্ডব যেন একশো মাদল বাজাতে শুরু করল মুহূর্তে। বাড়ির দিকে যেতে যেতে মাঝ রাস্তায় স্যাক্কারোরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—হতাশভাবে একবার তাকাল ওপরের দিকে।

বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখগুলো ঝাপসা হয়ে এলো—ঝাপসা হয়ে গুটিয়ে যেন একাকার হয়ে গেল। তিনজনেই তাদের জামাকাপড়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে কেমন ছোট হয়ে যেতে লাগলো—শেষ পর্যন্ত তিনটে দলা পাকানো কাপড়-চোপড়ের স্তূপ ছাড়া সামনে আর কিছু রইল না।

প্রচণ্ড আতঙ্কে গাড়ির মধ্যে একেবারে সেঁটে বসেছিল রাইটরা। লিলিয়ানের মুখ থেকে তার মন্তব্যের শেষটুকু যেন আপনা আপনিই বেরিয়ে এলো, '—চিনির তৈরী, আর বৃষ্টিতে তাদের ভয় ছিল তাই গলে যাবার।'

গল্পটা পড়ে নিশ্চয়ই খুব অবাক লাগছে, তাই না? স্যাক্কারো পরিবার ওরকম টুক করে গেল গলে কেন! যদি একটু বিজ্ঞান বুদ্ধির সাহায্য নেওয়া যায়, এগল্পরও কিন্তু একটা ব্যখ্যা দেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একটা কথা আছে—আইসোমার অর্থাৎ, দুটো পদার্থের গঠনগত উপাদানগুলো একই, অথচ তাদের অনুর মধ্যে তারা সাজানো আছে ভিন্নভাবে। বিজ্ঞান বলে, আইসোমারদের গঠন এক হলেও তাদের ধর্ম আলাদা। এই ভাবে চিন্তার সূত্র ধরে এটা কি মনে করা যায় না যে, স্যাক্কারো পরিবারের লোকদের দেহ আমাদেরই দেহের কোন আইসোমার দিয়ে তৈরী—যার ধর্ম জলে গুলে যাওয়া! এই ধরণের গল্পকে বলতে পারো সায়েন্স ফ্যাণ্টাসী অর্থাৎ, খানিকটা বিজ্ঞান আর অনেকখানি কল্পনা। অন্য সৌরজগতে এ ধরণের মানুষ থাকতে পারে কিনা তা নিছকই কল্পনা, কিন্তু এই গল্পে সেই কল্পনা গড়ে উঠেছে আইসোমারের বৈজ্ঞানিক সত্যকে ভিত্তি করে।

ছবি : শুভেন্দু ভট্টাচার্য

অনুবাদ : হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ইঞ্জিন-বিহীন ট্রেন

বিশ্বজিৎ দাস

নাম শুনে প্রথমটা আজগুবি মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। রহস্যটা লুকিয়ে রয়েছে ট্রেনকে চালু করার মূলে। ইঞ্জিনের মধ্যে কয়লা পুড়িয়ে জল ফুটিয়েই হোক, কিংবা সরাসরি বিদ্যুৎ থেকেই হোক—আমরা তৈরী করি যান্ত্রিক শক্তি। সেই শক্তিই ট্রেনকে টেনে নিয়ে যায়। এখন সেই শক্তি যদি আমরা বাইরে থেকেই ট্রেনটার ওপর প্রয়োগ করতে পারি···তাহলে ?

দেখা যাক তাহলে কি হয়।

মনে করো কোলকাতা থেকে একটা ট্রেন দিল্লী যাবে। মাটির নীচে দিয়ে কোলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলা হোলো এক মস্ত সুড়ঙ্গ। তবে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে সেটা যেন সোজা হয়, অর্থাৎ সরলরেখায়।

এই সুড়ঙ্গের মধ্যে পাতা লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের ইঞ্জিন বিহীন ট্রেন। মনে করো কোলকাতা স্টেশনে তাকে ব্রেক চেপে থামিয়ে রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে যেই ব্রেক আলগা করা হবে সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটতে আরম্ভ করবে।

কিন্তু কেন ? কারণটা খুব সোজা। পৃথিবীর কেন্দ্রের আকর্ষণেই সে এগিয়ে যাবে। কারণ যতই সে সুড়ঙ্গের মধ্যবিন্দুর দিকে অগ্রসর হবে ততই কেন্দ্রের থেকে তার দূরত্ব কমবে, আকর্ষণ বাড়বে, বাড়বে গতিবেগও। এবার ঐ প্রচণ্ড গতিবেগের তোড়ে ট্রেনটি মধ্যবিন্দু ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাবে দিল্লীর দিকে। এবার ক্রমেই তার গতিবেগ কমতে থাকবে। এমনি করে দিল্লী স্টেশন পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ব্রেক চেপে ট্রেনটাকে আটকাতে হবে ; নইলে সে আবার তক্ষুনি কোলকাতার দিকে চলতে শুরু করবে—অনেকটা পেণ্ডুলামের মতো।

তাহলে ছাখো এই এতটা পথ অতিক্রম করতে কিন্তু কোন ইঞ্জিনের প্রয়োজন হোলো না। তার বদলে বাইরে থেকে তার ওপরে কাজ করলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

যদি উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এইরকম একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করা যায় তাহলে ইঞ্জিন বিহীন ট্রেন মাত্র ৪২ মিনিট ১২ সেকেণ্ডেই এই সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে যাবে।

তবে মজার ব্যাপার কি জানো ? এই সময়টা কিন্তু সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে না। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই ট্রেনটা ঐ একই সময় নেবে। কেবল পরিবর্তন হবে তার গতিবেগের। সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাবে তার গতিবেগ।

কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে হোলো এই রকম একটা সোজা সুড়ঙ্গ তৈরী করা। প্রথমতঃ এ জাতীয় কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এখনও হয়নি ; দ্বিতীয়তঃ মাটির নিচের প্রচণ্ড তাপ এ কাজের বিরাট প্রতিবন্ধক। পৃথিবীর ওপরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও ভেতরটা এখনও কিন্তু বেশ গরম।

তাই বলে ইঞ্জিন-বিহীন ট্রেনের চিন্তা বিজ্ঞানীরা কিন্তু ছেড়ে দেননি। তাঁরা চেষ্টা করছেন বড় বড় তড়িৎ চুম্বক দিয়ে এই ট্রেন চালানো যায় কিনা।

বিরাট একটা বায়ুশূন্য তামার পাইপের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসানো থাকবে সারি সারি তড়িৎ চুম্বক। আর থাকবে লোহার তৈরী সেই গাড়ীটা। এবার প্রথম তড়িৎ চুম্বকে বিদ্যুৎ পাঠালেই সে লোহার গাড়ীটাকে তার দিকে টানতে থাকবে। গাড়ীটা মেঝে ছেড়ে ওপরে উঠবে। চুম্বকের গায়ে পৌঁছনোর আগেই তার বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে পরের তড়িৎ চুম্বকে বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হয়ে যাবে। ফলে মাধ্যাকর্ষণের টানে গাড়ীটা নীচে পড়তে না পড়তেই দ্বিতীয় চুম্বক তাকে টানতে শুরু করবে। এমনি করে গাড়ীটা এঁকতে বেঁকতে এগিয়ে যাবে অত্যন্ত দ্রুত। এই ট্রেনে চড়ার মজা হোলো এই যে, গাড়ী চলছে বলে মনেই হবে না কারণ পাইপের মধ্যে বাতাস না থাকায়

ঘর্ষণ প্রায় থাকবেই না।

ঠিকমতো একের পর এক তড়িৎ চুম্বকগুলোয় বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালু করা, বন্ধ করা ব্যাপারটা বেশ জটিল হলেও অসম্ভব কিন্তু মোটেও নয়। ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে টমস্ক ইনসষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এর একটা ছোট মডেল তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে যদিও ছোট গাড়ীটার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬ কিলোমিটারের বেশী হয়নি, তবু বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে বলেছেন যে দীর্ঘ পথের ক্ষেত্রে দশ হাজার টন ঘাড়ে নিয়েও এই গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ কিলোমিটারের মত গিয়ে দাঁড়াবে। আর খরচা? সে অতি নগণ্য।

মুখ দুটোকে জুড়ে দাও তাহলে কি তার মধ্যে ঐ বিদ্যুৎ তখনও প্রবাহিত হবে?

নিশ্চয়ই নয়। কারণ ব্যাটারীই যখন নেই তখন বিদ্যুৎ আসবে কোত্থেকে? কিন্তু অতি পরিবাহীর ক্ষেত্রে ঠিক এই ঘটনাই ঘটে। একবার বিদ্যুৎ পাঠিয়ে দিলে দীর্ঘ সময় ধরে অতি পরিবাহী তারের কুণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে। তিন বছর বাদেও দেখা গেছে ব্যাটারী নেই অথচ বিদ্যুৎ ঠিক প্রবাহিত হচ্ছে।

তড়িৎ চুম্বক দিয়ে ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে এই অতি পরিবাহী তার দিয়ে তড়িৎ চুম্বক তৈরীর কথা ভাবা হচ্ছে। এতে জিনিসটার আকৃতিও যেমন ছোট হবে, তেমনি খরচও

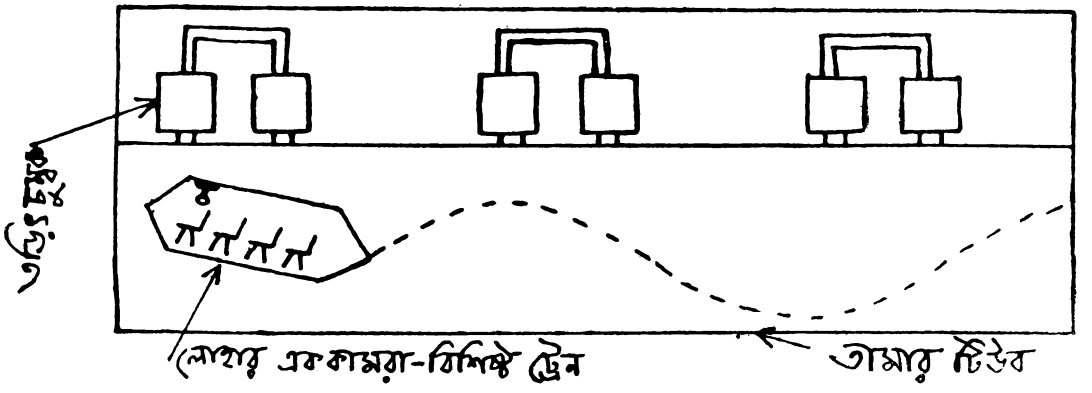

এই তড়িৎ চুম্বক দিয়ে আরও একভাবে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিকদের মাথায় রয়েছে। সেটা হোলো একটা তড়িৎ চুম্বক দিয়ে ট্রেনকে টেনে আনা। এর জন্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কতো জোরালো তড়িৎ চুম্বক দরকার আর তার আকৃতিও হবে তেমনি বিরাট। কিন্তু বর্তমানে অতি পরিবাহী তারের সাহায্যে তৈরী বিদ্যুৎ চুম্বক খুব ছোট অথচ তার শক্তি অত্যন্ত জোরালো।

অতি পরিবাহী ব্যাপারটাও খুব জটিল। তবু একটু সহজ করে বলে নিই। মনে করো একটা তারের কুণ্ডলীর মধ্যে ব্যাটারীর সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠাচ্ছো, এবার যদি হঠাৎ ঐ ব্যাটারীটাকে সরিয়ে নাও আর সঙ্গে সঙ্গে তারের

কম হবে।

তবু, এর ক্ষেত্রেও একটা 'কিন্তু' আছে। এই সুতীব্র চুম্বক শক্তি মানুষের দেহের কোন ক্ষতি করবে না তো? এ নিয়ে চিন্তা ভাবনার শেষ নেই। এজন্যই গড়ে উঠছে নতুন এক গবেষণার ক্ষেত্র, নাম তার প্রাণী চৌম্বক তত্ত্ব (Bio-magnetism)।

এতসব 'কিন্তু', 'যদি', 'হয়তো' অব্যয়ের ভীড়েও আমরা আশা করে আছি এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন আমরা এই ইঞ্জিন বিহীন ট্রেনে চড়ার সুযোগ পাবো। নক্ষত্র বেগে ছোটা সেই ট্রেনে চেপে কি মজাটাই না সেদিন হবে!

বিজ্ঞানী

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আর্যভট

গৌরীশঙ্কর

পৃথিবীটা আমাদের আস্তানা। তার কথা কি আর আমরা কম ভেবেছি, তার নাড়ী নক্ষত্রের চুলচেরা খবর আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। তবুও আমাদের ভাবতে হয়েছে —এই পৃথিবীটাই সব নয়। সময়ে অসময়ে বার বার করে আকাশের কথাও ভেবেছি। মহাশূন্যের মাঝে পাঁচ দশটা জ্যোতিষ্কের মতন আমাদের পৃথিবীও ভাসছে, তারাও সকলে একটা নিয়ম মেনে কাজ করছে, কোন অঘটন ঘটছে না, আমরাও ঠিক তেমনি নিয়ম মেনে চলেছি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে আজ আমাদের জানাটা কত সহজ সরল হয়ে এসেছে, বুদ্ধিসুদ্ধি সব তালগোল পাকিয়ে আমরা কোন কিছুতে তেমন আর অবাক হই না।

আসলে সত্যিকারের বুদ্ধি দিয়ে মনের সঙ্গে তর্ক করে বিচার করে যা বাস্তব তাকেই আমরা মেনে নিয়েছি। একে আমরা বলেছি খাঁটি সত্য। অন্য নাম জ্ঞান। মানুষের মনে এই জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানবোধ জেগেছে বলেই আজ আমরা সত্যি মিথ্যের মধ্যে বিভেদটা ধরতে পারছি।

কিন্তু পুরণো দিনের কথা একটু ভাব দেখি। এমন একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের ঘটনা, সব বিষয় আমাদের কাছে প্রচণ্ড রকমের উদ্ভট ধোঁয়াটে বলে মনে হত। এর কারণটা হল মনটা তখন আমাদের নেহাৎই কাঁচা ছিল। এর ফলে দুটো একটা শতাব্দী নয়, অমন কত হাজার শতাব্দী ধরে অজস্র আজগুবি ধারণা গল্পকথা লতা-পাতায় সরস হয়ে মানুষের মনে গজিয়ে উঠল। পৃথিবী অথবা জ্যোতিষ্কদের নিয়ে বাস্তব ব্যাপার জানা না থাকায় একজন পণ্ডিত হয়তো তড়িঘড়ি নিজের মনগড়া একটা মত খাড়া করে ফেললেন। আগেকার দিনে পণ্ডিতদের কি আর কম দাপট ছিল, ভুল হক, তবু জোর করে লোকের ঘাড়ে তাঁদের মতটাই চাপিয়ে দেওয়া হত। পরবর্তী যুগে আরও কত নাম-কা-ওয়াস্তে পণ্ডিত এলেন-গেলেন। তাঁরাও চলতি অভিমত নস্যাৎ করলেন, আবার চোখ রাঙিয়ে লোকেদের মধ্যে নিজেদের মতও জাহির করে দিলেন। পণ্ডিতদের কাছ থেকেই যখন বুদ্ধি, বিচার, বাস্তববোধ. তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের জ্ঞান আমরা পেলাম না, তখন এতে সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড লোকসানটাই

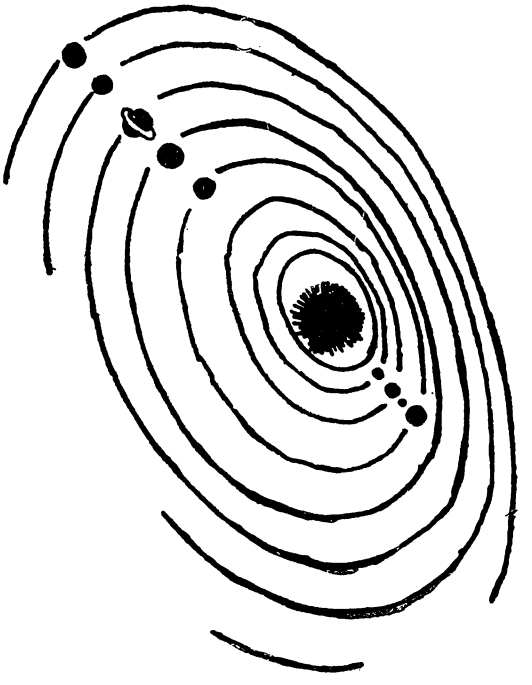

হল। আমরা খোলা মন নিয়ে কাজ করতে শিখলাম না, স্বাধীন বুদ্ধি চিন্তার কোন কদর রইল না, আমরা অসার বিষয়কে সার মনে করে গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম।

কিন্তু রক্ষে এই পৃথিবীশুদ্ধ লোকে ভুল পথে চললেও এমন দেখা গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাবে যে আমাদের মধ্যে অন্তত একজন মানুষ কোন ভুলকে আর ঠিক বলে মেনে নিতে পারছেন না। এঁরা ভয়ানক একগুঁয়ে স্বভাবের লোক। মনে কর প্রচলিত কোন বিশ্বাস, আসলে সেটা বিজ্ঞানসম্মত নয়; অথচ লোকের কাছে তার ভয়ানক কদর। এই আলাদা ধরণের মানুষ কিন্তু মুখ বুজে হেঁটমুণ্ডে এমন

ধারণা মেনে নিতে পারবেন না। মনের সঙ্গে তখন তিনি প্রচণ্ডভাবে লড়াই করতে নেমে নতুন করে অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করেছেন। যেখানে যত খটকা, যুক্তি দিয়ে তা বাস্তব না গ্রহণযোগ্য সেই বিচারটা আমাদের হাতে তুলে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। এমন মানুষ অবশ্য লাখে একটা মেলে। যেহেতু তাঁরা সত্যের অনুসন্ধানী অতএব অন্য অর্থে এঁরাই বিজ্ঞানী।

এমন একজন বিজ্ঞান সাধকের কথা আমরা নতুন করে আজ একটু ভাবব, তাঁর কথা সামান্য কিছু আলোচনা করব। আর্যভট নামটা অন্তত শুনেছ। এঁরই নামে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট'কে মহাকাশে ছাড়া হয়েছিল। খুব সঙ্গত স্মৃতিরক্ষা হয়েছে। সে যাই হোক, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে. খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, আর্যভটকে আমরা পেয়েছিলাম। সকলেই তো জান, আজকের পাটনাকে এককালে পাটলীপুত্র বলা হতো। আবার এই পাটলীপুত্র বা তার আশপাশের জায়গা কুসুমপুর নামেও নাকি পরিচিত ছিল। কেউ বলেন আর্যভট এই কুসুমপুরে জন্মেছিলেন এবং এখানকার বাসিন্দা ছিলেন। আবার অন্যেরা বলেন তিনি এই কুসুমপুরে বসে কেবল গবেষণা চালিয়েছিলেন কিংবা পুথিপত্র রচনা করেছিলেন। তিনি যেখানকারই লোক হয়ে থাকুন, মোট কথা তিনি যে আমাদেরই দেশবাসী ছিলেন, এটাই আমাদের গর্ব।

আর্যভটের গুণের অন্ত ছিল না। সেই কত কাল আগে বিজ্ঞান অথবা জ্যোতিবিজ্ঞানে কত ভাল কাজের সাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। তিনি এই পৃথিবীটাকে জগদ্দল পাথরের মত স্থানুবৎ মনে করতে পারেন নি। এর বদলে একটা গতির কথা তাঁকে বলতে হয়েছিল। আরও বড় হয়ে আমাদের দেশের শাস্ত্র যদি পড়, তাহলে দেখবে পুরাণে লেখা আছে এক কূর্ম বা কচ্ছপ, কল্পনায় আনা যায় না এত বিশালকায়, তার পিঠের চার দিকে মুখ করে রয়েছে চারটে বিরাট বিরাট হাতী, আর এই হাতীরাই তাদের পিঠের ওপর ধরে রেখেছে একটা অর্ধগোলক। সেটাই আমাদের পৃথিবী। আবার, সর্প বা নাগমাতা বাসুকির মাথায় পৃথিবীকে ধরে রাখার মজাদার কাহিনীরও প্রচলন আছে। এসব শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্মের কথা, মিথ্যে তো আর বলা যায় না! যুগ যুগ পার হয়ে গেল, লোকে বাস্তব-অবাস্তবের কোন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাল না, নির্বোধের মত এসব কাহিনী হজম করে চলল। আরও যদি পিছিয়ে যাও, ঋকবেদের যুগে, সেখানেও দেখছি পৃথিবীর গোল আকৃতির কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে বটে, তবে জেনো—তাও খুব অস্পষ্টভাবে। আচ্ছা, এই ভারতবর্ষে আমরা না হয় আর্যভট্টের আগেকার সময় পর্যন্ত আমাদের এই পৃথিবীর গোল আকৃতির কথা কেউ কিছু ভাবতে পারে নি, কিন্তু সারা পৃথিবীতে আর পাঁচটা দেশে মানুষ কী ভেবেছিল? গ্রীস দেশের কথা তা হলে বলতে হবে। আর্যভট্টের এক হাজার বছর আগে পিথাগোরাস মানতেন যে পৃথিবী গোল। আর্যভট কিন্তু সুন্দরভাবে বিশদ একটু ব্যাখ্যার সাহায্যে বললেন পৃথিবী চ্যাপ্টা সমতল নয়, চলতে চলতে এ চলাটাও একদিন শেষ হয়ে যাবে না, পৃথিবীর আকৃতি বরং একটা কদম ফুলের মত—এক জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করলে আবার একদিন সেখানে ফিরে আসবে।

এসব কথা আমরা পাচ্ছি 'আর্যভটি'য় বইয়ে। আর্যভটের

With best compliments from :

Phone 34-2873

SENCO JEWELLERY HOUSE

Manufacturing Jewellers &
Order Suppliers

170/2, Bepin Behari Ganguli Street
Calcutta-12

সাক্ষাৎ শিষ্য-সামন্তেরা গুরুর যা কিছু চিন্তা ভাবনা সব এই বইয়ে সংকলন করে রাখেন। সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু চমৎকার বই। এমন কিছু ঢাউস আকারের বই নয়, কিন্তু ঠাসা এতে মালমশলা। বইটার চারটে ভাগ আছে, যেমন—দশগীতিকা, গণিতপাদ, কালক্রিয়া আর গোলপাদ। পৃথিবীর গোলকত্ব সম্বন্ধে তাঁর যা কিছু বক্তব্য সে সবই এই গোলপাদ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

কিন্তু যে কাজের জন্য আর্যভটের কীর্তি অক্ষয় হয়ে রইল সেটা হল পৃথিবী যে নড়েচড়ে না, বেবাক স্থির, হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া এই ধারণা তিনি মানতে পারলেন না। আজও দেখছি আগেও দেখেছি সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। এই দিন, কত আলো, পৃথিবীতে চাঞ্চল্য—তবু সূর্য পাটে বসবেই। তখন অন্ধকার, সেটা রাত্রি, তখন বিশ্রাম। কিন্তু এমন পরিবর্তনটা কেন? দিন রাত্রির হিসেব কেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে? আর্যভট ভাবতে বসলেন। অঙ্কে তাঁর খুব উঁচু মাথা, তিনি আঁকজোক গণনা করে সমস্যার সমাধান করে ফেললেন।

দিন-রাতের কারণ নানান অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। পৃথিবীর আহ্নিকগতি আছে বলেই এটা হয়। আর্যভটের এটা বুঝে নিতে হয় নি, তবে আহ্নিকগতি না বলে তিনি একে বলেছিলেন ভূ-ভ্রমণবাদ। গতি বুঝতে তিনি দুটো কথা ব্যবহার করলেন। একটা হল অনুলোকগামী গতি, অর্থাৎ কিনা যে গতি পশ্চিমমুখো। আর্যভট উপমা ব্যবহার করে এ জিনিস বোঝাতে চাইলেন। বড় সুন্দর, সার্থক এ উপমা। কোথাও কোন গোঁজামিল রাখলেন না। পরিষ্কার করে দৃঢ়ভাবে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন—মনে কর এক ব্যক্তি নৌকায় চলেছেন। তিনি অনুলোম গতিযুক্ত অর্থাৎ পশ্চিমমুখো হয়ে চলেছেন। তখন নদীতীরের ঘরবাড়ি গাছপালা সব বিলোমগামী হবে, অর্থাৎ বিপরীত দিকে হু-হু করে সরে যাবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না। তাহলে, পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে গ্রহ-নক্ষত্রকে অর্থাৎ ভগনকে সরে যেতে দেখলেও কি মনে করতে হবে যে এটাই আসল গতি, আর পৃথিবীকে ঘুরতে দেখছি না বলেই কি মনে করে নেওয়া সঙ্গত হবে যে এই পৃথিবী আসলে স্থির ছাড়া আর কিছু নয়? বিজ্ঞানীকে কি ধরণের মানুষ হতে হবে সে বিষয়ে দু-চার কথায় আগে কিছু বলেছি। ভাবলে বিস্ময় বাড়ে, আবার আর্যভটের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে যে সেই দেড় হাজার বছর আগে আর্যভট পৃথিবী, আকাশ অর্থাৎ এই বস্তুজগৎ নিয়ে ঠিক ঠিক কথা বলার ব্যাপারে যুক্তিতে ভরপুর এমন মন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রহের গতি আছে। এটা মানতে গিয়ে আর্যভট্ট বললেন যে পৃথিবীর সঙ্গে ভূবায়ুরও ধীরে ধীরে আবর্তন আহ্নিকগতির মস্ত বড় প্রমাণ। তারপর, জ্যোতিবিজ্ঞানে সৌরবর্ষ বলে একটা কথা আছে। এখন শুধু কথাটা বলে রাখলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এই একটা সৌরবর্ষে কতবার আহ্নিকগতি হতে পারে সেটাও তাঁর জানা ছিল।

তারপর দিন-রাত্রি গণনার ব্যাপার। দিনের গণনা কখন থেকে শুরু করবে? তোমরা বলবে কেন, সূর্য ওঠার সময় থেকে? কর, ক্ষতি নেই। আর্যভট এটাও করলেন, আবার মধ্যরাত্রি থেকে অন্য একদিন অর্থাৎ এক হিসেবে অন্য এক তারিখ শুরু হচ্ছে সেটাও মানলেন। আগের পদ্ধতিটাকে বললেন ঔদয়িক, আর শেষেরটাকে বললেন আর্ধরাত্রিক। তাঁর চিন্তায় এ এক বৈচিত্র্য বটে!

ইতিমধ্যে একটু থামছি। ততক্ষণে তোমরা আগের কথাগুলো নিয়ে ধীরে সুস্থে কিছু ভেবে নাও। তারপর তোমরা নিশ্চয় আরও কিছু প্রশ্ন করবে। আমি উত্তরগুলো একটু ঠিক করে নিই। আমার কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে তোমরা এবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুটো জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাইবে। আর্যভট তো পৃথিবীর গোলকত্ব মানলেন, পৃথিবীকে নিশ্চল না ভেবে তার দৈনিক গতি অর্থাৎ আবর্তনের দাবী জানালেন, দিন রাতের গণনা এবং আহ্নিক-গতির হিসেবও দিলেন। কিন্তু সূর্যকে কেন্দ্র রেখে তার চারদিকে গ্রহ বা পৃথিবীর প্রদক্ষিণের কথা কি তিনি ভাবেন নি? কিংবা গ্রহদের চলার রাস্তা বা কক্ষপথ কেমন হতে পারে সে সম্বন্ধে কি কোন চিন্তাই করেন নি?

সত্যিকারের অসাধারণ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন আর্যভট। তিনি এসব ব্যাপার নিয়ে অক্লান্তভাবে কত চিন্তা যে

জন্মদিনের উপহার
আনন্দ তার বোন শীলাকে নিয়ে মেলায় এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে এক বেদে কুকুরছানা বিক্রি করছে।
-ইস্, কি মিষ্টি আমি এটা কিনবো।
-মাত্র ১০০ টাকা।
ওরা ভেঙ্গে পড়লো।
-আমাদের যে মাত্র ৫ টাকা আছে চলো শীলা- কাঁদেনা। দেখো, এবারে তোমার জন্মদিনে আমি তোমায় একটা কুকুরছানা দেবই দেবো।
ঐ দিনই আনন্দ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো-
-বাবা, শীলার জন্মদিনে উপহারের জন্যে আমি কিছু জমাতে চাই। কি ভাবে জমাই বলো তো!
-খুব সোজা। রোজ করে জমাও। আমি ইউকোব্যাঙ্কে তোমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেবো।
-ইউকোব্যাঙ্ক! আমি যা জমাবো, তা কি ওরা নেবে? সে তো খুবই কম।
-নিশ্চয়ই নেবে। নিয়মিত জমিয়ে যাও, বছরের শেষে দেখবে অনেক জমেছে।
United Commercial Bank
সেদিন থেকেই আনন্দ জমাতে শুরু করল।
শীলার জন্মদিনের ঠিক আগে আনন্দ তার পাশবই বাবাকে দেখায়।
-বাবা, ব্যাঙ্কে আমার ১৫০ টাকা জমেছে। এইবারে নিশ্চয়ই শীলাকে কুকুরছানা কিনে দিতে পারবো।
-চমৎকার!
জন্মদিনের সকাল
-আনন্দকে ধন্যবাদ দাও। তোমাকে এই কুকুরছানা কিনে দেবার জন্যে সে তার হাত খরচ থেকে এ টাকা জমিয়েছে।
-শীলার আজ ভারী আনন্দ কিন্তু সেটা তো ইউকোব্যাঙ্কের জন্যেই
ভৌ! ভৌ!
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান
UCO/CAS-79/80-BEN

করতে পারেন তার ভুরি ভুরি কথা তাঁর বইয়ে লেখা আছে। আজ এসব ব্যাপার যেমন আমরা বুঝি, অমন টনটনে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাঁর হয়তো ছিল না। তবুও অতীত অনেকের কাছে যেসব চিন্তা অসম্ভব বলে মনে হত, এটাই সবচেয়ে বড় কথা যে সেখানেও তিনি নিজের প্রতিভার প্রমাণ রাখতে পেরেছিলেন। সূর্য কেন্দ্রে এবং স্থির কি না, এর সরাসরি কোন উত্তর আর্যভট দেন নি। তিনি শুধু আমাদের বুদ্ধিকে একটু খোঁচা মেরেছিলেন। বলেছিলেন একটু চেষ্টা করলেই আমরা নিজেরা এমন জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজ করে নিতে পারব। আমরা দেখি যে সূর্য আকাশে চলে। অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরছে বলেই তো মনে করব চোখের দেখাটা ঠিক নয়। আসলে পৃথিবী ঘুরছে। এ-ক্ষেত্রে সূর্যের চলার কথাটাকে আর তাহলে ভাবা যাবে না। তাহলে কি ভাবব? সূর্য কি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই?

তোমরা যারা একটু উঁচু ক্লাসে পড়ছ তারা কোপারনিকসের নাম পেয়েছ এবং সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের সব কৃতিত্ব ওই কোপারনিকসকেই দিতে চাইবে। কোপারনিকসকে কি আর ছোট করতে পারি? তা নয়। তবে কোপারনিকসেরও অনেক আগে গ্রীসদেশের ফিলোলাউস আর আরিস্টর্কাসও সূর্যকেন্দ্রিক ধারণায় বিশ্বাস করতেন। তবে তাঁরাও সুস্পষ্টভাবে তাঁদের আলোচনাকে জোরদার করতে পারেন নি।

আর্যভটের আর একটা সুন্দর কাজের নমুনা হল তিনি গ্রহগতির কথা বলতে গিয়ে কক্ষপথের কথাও ভেবেছিলেন। তোমরা জ্যামিতিতে 'পাই'-এর ব্যবহার জান। আর্যভটও এর ব্যবহার রপ্ত করেছিলেন। তোমরা ঘনমূল বর্গমূল, সমীকরণ কত কিছু শিখছ। আর্যভটও এসবের চর্চা করেছিলেন। বৃত্ত নিয়ে কত অসংখ্য কথা ভাবতে ভাবতে তিনি গ্রহদের কক্ষপথকে উৎকেন্দ্রিক বৃত্ত বলে মনে করেছিলেন।

যাঁর এত প্রতিভা, কাজে যাঁর এত নিষ্ঠা, কি অদ্ভুত মেধা মানুষটির, এদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার একটা পাকা বুনিয়াদ যিনি গড়ে দিয়েছিলেন, যাঁকে আমরা কোনদিন ভুলতে পারিনা, অথচ তাঁর পরবর্তীকালের কোন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীই তাঁকে সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর তত্ত্বকে কেউ স্বীকার করেন নি। কি নির্মম পরিহাস!

বাস্তবের মুখোমুখি

সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় চারদিক থেকে স্তূপীকৃত নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে।

এই শহরের সমস্যা চিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ। আলোবাতাসহীন অন্ধকার নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি, খোলা নর্দমা, খাটা পায়খানা, স্তূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা-দিনে মাছি, পথ কুকুর, ছাড়া গরু, পানীয় জলের অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, হকারি, মস্তানি, গুণ্ডামি, ভেজাল ওষুধ, মদের চোরাকারবার, জুয়া, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলান্ত গহ্বরের দিকে।

কিন্তু তবু এই কলকাতার নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে থেকেই জীবনের শত সহস্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। খেলার মাঠ, ময়দানের সভায়, পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্যোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈর্য ধরতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত। তাই আমাদের আবেদন:

১। জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবেন।

২। নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না।

৩। রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

৪। দেওয়ালে কুৎসিৎ কিছু লিখবেন না।

৫। ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন না।

৬। রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি। কর বাকী ফেলবেন না।

৭। ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন।

গঠনমূলক সমালোচনা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে।

কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত

॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥

দুর্গা বসু : গৃহীর গাইড ১৫·০০

বর্তমানে গৃহীর একটি প্রধান সমস্যা গৃহের। নিজস্ব গৃহ নির্মাণের স্বপ্ন চরিতার্থের পথে প্রধান বাধা অর্থের আনুকূল্য। অজ্ঞতার জন্য মানুষ বড় বড় গৃহ নির্মাণকারিদের হাতে শিকার হয়। সুবিখ্যাত আর্কিটেক্ট শ্রীদুর্গা বসুর 'গৃহীর গাইড' বইখানি পাঠ করলে বিভিন্ন স্তরের মানুষের পক্ষে এইসব বাধা দূর হয়। আপন পছন্দমত একখানি সুন্দর বাসা তৈরী অতি সহজেই সম্ভব। বাড়ীর নানা ধরনের নক্সা, ছবি ইত্যাদি, সরকারী ও বেসরকারী ঋণ কিভাবে পাওয়া যায় তাহাও এই বইখানিতে সযত্নে বিবৃত হয়েছে।
এ ছাড়া সস্তায় বাড়ী কিভাবে সাজাতে হয়, ইলেকট্রিফিকেশন, বাগানের প্ল্যান ইত্যাদিও ছবির সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি অমূল্য গ্রন্থ সন্দেহ নেই।

ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন স্বল্পায়ু জীবনকালে গণিতে যে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন তা আজও বিশ্বের পরম বিস্ময়

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

অনন্য প্রতিভা রামানুজন ৮·০০

বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন গ্রন্থ। অখ্যাতির অন্ধকার থেকে বিশ্বখ্যাতির আলোকতোরণে উত্তরণের অনুপম কাহিনী—যা পাঠক-পাঠিকাকে শুধু অভিভূতই নয়, অনুপ্রাণিতও করবে।

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

জীবের ক্রমবিকাশ ৪০·০০

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

এতে আছে বর্তমান জীবজগতের সঙ্গে পরিচয়, জীব মণ্ডল, জৈবনিক প্রক্রিয়া সমূহ, ভিটামিন, হরমোন, প্রজনন-বিদ্যা, অভিব্যক্তিবাদ, জীব এল কোথা থেকে, জীবের ক্রমবিকাশ, অভিযোজন ইত্যাদি সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্বসমূহ। এমন বই বাংলা ভাষায় তো বটেই, ইংরেজী ভাষাতেও দুর্লভ।
পাতায় পাতায় ছবি—হাফটোন ও রেখা চিত্র আছে প্রায় চারশ এবং আর্টপ্লেটে ছাপা রঙীন চিত্র নয়টি।

সমরেন্দ্রনাথ সেন

অদৃশ্য জগৎ ৩০·০০

(তৃতীয় সংস্করণ)

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' এর লেখকের নবতম অবদান। রেডিও-নক্ষত্রজগৎ কোয়াসার, পালসার, মহাকাশের এক্সরে, অণুতরঙ্গ ইত্যাদি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিককালে জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায় যে যুগান্তর ঘটে গেল তার অনবদ্য প্রামাণিক আলোচনা। আর এতে রয়েছে সৃষ্টি রহস্যের উপর নতুন আলোকপাত। বহু চিত্রে শোভিত।

ডঃ রমেন মজুমদার

নলজাতকের উপাখ্যান ১৫·০০

(টেস্ট-টিউবে শিশুর জন্মকথা)

টেস্ট-টিউবে বিশ্বের প্রথম মানব শিশু লুইজি ব্রাউনের জন্ম কী ভাবে? দ্বিতীয় নবজাতক মানব শিশু দুর্গা আগরওয়ালার জন্মের কোথায় পার্থক্য? অনেক চিত্র ও ফটো দ্বারা শোভিত।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সুভাষ সান্যাল

চিঠিখানা পেয়ে রঘু একটু অবাকই হয়েছিল। প্যারাসাইটোলজির বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাকে প্রায়ই নানা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু এরকম সমস্যায় সে কোনদিন পড়ে নি।

অতি সংক্ষিপ্ত এই চিঠিটা পাঠিয়েছে এলাহাবাদের মাইল পঞ্চাশ দূরে লোহাগাড়া থেকে তার বিশেষ বন্ধু স্ট্যাটিস্টিকসের অধ্যাপক অভিজিৎ। চিঠির ভাষাটা অদ্ভুত—'ভীষণ দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারিস কলেজ থেকে সপ্তাখানেকের ছুটি নিয়ে চলে আয়।' দরকারটা বোঝাবার জন্যেই বোধহয় অভিজিৎ খবরের কাগজের দুটো কাটিং সঙ্গে পাঠিয়েছে। এলাহাবাদের কাছাকাছি কোন্ একটা গ্রামে বিধ্বংসী গো-মড়ক লেগেছে—এই একটা খবর। আর একটা খবর—এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত! গো-মড়কের কারণ ও তার প্রতিকার আজকের দিনে প্রায়ই কোন সমস্যা নয়। সেজন্যে একটা তদন্ত কমিশন বসাতে হল? দ্বিতীয়ত, ওখানে মলিকিউলার বায়োলজির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ডঃ শেষাদ্রি থাকতে অভিজিতের তাকে এমন কি দরকার পড়লো? কিন্তু যেতে লিখেছে অভিজিৎ, সুতরাং না যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ট্রেনের একটা টিকিট আর রিজার্ভেশন।

লোহাগাড়া পি-ডাবলিউ-ডি ইনস্পেকশন বাংলোয় অভিজিৎ ছাড়া বাকি যে দুজন রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় অভিজিতই করিয়ে দিয়েছিল। এলাহাবাদ ভেটেরিনারী কলেজের সার্জন ডাঃ আয়েঙ্গার এবং পশুপালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হোমড়া চোমড়া অফিসার মিঃ অযোধ্যাপ্রসাদ। চায়ের টেবিলে সাধারণ ভাবে আলোচনা হচ্ছিল। এই গো-মড়কে সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সরকার কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন মিঃ অযোধ্যাপ্রসাদ সে কথাই বলছিলেন, কারণ কৃষি আর পশুপালনের ওপর উত্তরপ্রদেশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল, তাছাড়া রোগটা আশেপাশে দ্রুত ছড়াবে কিনা, তাও তো বিশেষ ভাববার বিষয়!

চা-পর্ব সমাধা হবার পর অভিজিৎ বলল, 'এই ব্যাপারে যেসব প্যারাসাইটোলজিক্যাল অবজারভেশন হয়েছে, ডাঃ আয়েঙ্গারই তা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।'

ডাঃ আয়েঙ্গার একটা সিগারেট ধরালেন।

—"আসলে এই ঘটনা ঠিক দু-একদিনেই ঘটে

নি। খোঁজখবর নিয়ে আমরা জানতে পেরেছি গত দু-তিন সপ্তাহ ধরেই ঐ সব গরু-মহিষগুলো অসুস্থ ছিল। সব সময়ই ঝিমুনির ভাব, খাওয়া-দাওয়াও করতো কম। এগুলো সবই 'স্লিপিং সিকনেসের' পূর্বলক্ষণ!"

রঘু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। একটু ইতঃস্তত করে বলল—"কিন্তু স্লিপিং সিকনেস তো এশিয়ার রোগ নয়। বিষুবরেখা বরাবর আফ্রিকার দেশগুলো আর দক্ষিণ আমেরিকার বিশেষ কিছু অঞ্চলে এ রোগ হয় বলে শুনেছি। এ দেশে একেবারে হতে পারে না তা নয়, তবে"—আস্তে আস্তে কপালে টোকা দিলেন ডাঃ আয়েঙ্গার।

—'রোগটা যে স্লিপিং সিকনেস, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

—'কিন্তু এ অসুখ মহামারীর মত ছড়াবে কি করে; যদি না একটা সুস্থ পশু কোন অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে আসে?'

—'হতে পারে—যদি কোন বিশেষ ধরণের মশা বা মাছি 'বাহক' হিসাবে এই রোগ ছড়ায়।'

—'আপনি 'শী-শী' মাছি বা 'রুডোভিড' পোকার কথা বলছেন তো?' রঘুকে একটু চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। —'কিন্তু সেগুলো তো মানুষের স্লিপিং সিকনেসের কারণ বলেই জানি!'

সিগারেটের পোড়া টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে মাথা নাড়লেন ডাঃ আয়েঙ্গার।

—"পশুদের ক্ষেত্রে 'বাহক বা ভেক্টর' খোঁজার অনেক চেষ্টা হয়েছে এখানে। লোহাগাড়ার আশে-পাশের এলাকার সার্ভে রিপোর্ট বলছে—স্লিপিং সিকনেস ছড়াতে পারে এমন কোন পোকামাকড় এখানে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমন কি যাদের বলা যায় রোগের 'রিজার্ভার' মানে যারা এই রোগের প্যারাসাইট শরীরে নিয়েও দিব্যি থাকে—গত এক মাসে জুলজিক্যাল সার্ভের লোকেরা তন্ন তন্ন করে তাও খুঁজেছে, ফলাফল আগের মতই!"

—'আশ্চর্য'!

—"আশ্চর্য হবার আরও খবর আছে ডঃ ব্যানার্জী। রোগলক্ষণ সব স্লিপিং সিকনেসের সঙ্গে মিলে গেলেও রক্তে বা পোষ্ট-মর্টেম রিপোর্টে কোন 'লিসম্যানয়েড' বা 'ট্রাইপ্যানোসয়েড' পাওয়া যায় নি!"

চেয়ারটা একটু সরিয়ে বসলেন অযোধ্যাপ্রসাদ।

—'লিসম্যানয়েড, ট্রাইপ্যানোসয়েড—মানে, আমার তো ঠিক এসব ব্যাপারে—'

—"ব্যাপারটা আমি একটু বুঝিয়ে বলছি।" সিগারেটের কেস খুললেন ডাঃ আয়েঙ্গার।

—"স্লিপিং সিকনেস রোগটার জন্য দায়ী যে পরজীবি প্রাণীটি, তার নাম ট্রাইপ্যানোসোমা। এদের জীবনচক্রে আবার বিশেষ কতগুলো দশা থাকে। তাদের নানা নামও আছে যেমন, লিসম্যানয়েড, লেপটোমোনাড, ট্রাইপ্যানোসোম্যাল—এই সব। আসলে মাইক্রোসকোপের নীচে এদের এক একরকম চেহারা তাই নামও নানারকম।"

—'তাহলে?' রঘু বলল—'আপনার কি ধারণা?'

—'আমার সমস্তটাই কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে। কারণ এর ওপর আবার আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি।'

—'কি বলুন তো?'

—"প্রায় সবকটা স্লাইডেই আমি বিশেষ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দেখেছি। দেখে মনে হচ্ছে 'ই-কোলাই।' কিন্তু স্লাইডে 'ই-কোলাই' আসে কি করে? এরা সবসময়ই পেটে অন্ত্রের মধ্যে বাস করে পরিপাকের কাজে সাহায্য করে। উপকারী বন্ধু।"

ডাঃ আয়েঙ্গার একটু থামলেন।

—"আসলে আমার মনে হয় ডঃ ব্যানার্জী কোন অজানা 'রিজার্ভার' থেকেই রোগটা ছড়িয়েছে। গত দু-মাসে আমরা সম্ভব অসম্ভব গাছপালা, পশুপাখী, এমন কি 'স্নেল' মানে শামুক পর্যন্ত পরীক্ষা করে ট্রাইপ্যানোসোমা খুঁজেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'রিজার্ভার' কিছু একটা পাবোই।"

রঘু একটু হাসলো।—'তাহলেও কিন্তু সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে। রোগ হচ্ছে অথচ রোগের জীবানু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে না?'

—'সেইজন্যেই তো আপনাকে ডাকা। আপনি কোন আশার আলো দেখাতে পারেন?'

—'আপাততঃ কিছুই না। এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে কিছু বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে।'

—'ওয়েল, আপনি তো টায়ার্ড, অন্ততঃ একটা দিন এখানে রেষ্ট নিন তারপর না হয়'—

রঘু অন্যমনস্কের মত ঘাড়টা নাড়লো।

●

ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। জানলা দিয়ে বাইরে আকাশ দেখে বোঝা যায় অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। দরজা খুলে রঘু এসে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালো।

রাস্তার ওপাশে মাঠ। সামনের গাছটায় কতকগুলো পাখী কিচিরমিচির করছে। খয়েরী গা, ঠোঁটটা হলদে। কি পাখী ও-গুলো? খানিকটা আনমনে শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে গাছটার দিকে এগোয় রঘু। আকাশে তূলোর-পাহাড়ের মতো নরম মেঘের স্তূপ। তার ফাঁকে লাল, হলুদ, বেগুনী, সোনালী রংয়ের খেলা চলছে—গোলাপী গাঢ় হয়ে আকাশে লালের ছোপ। কয়েক মুহূর্তমাত্র। সিঁদুরে থালাখানা একটু একটু করে উপরে উঠতে উঠতে টুক্ করে দিগন্তসীমার আকাশে যেন লাফিয়ে উঠল।

অপূর্ব! সূর্যোদয়ের এই দৃশ্য দেখতে দেখতে রঘু কখন গাছতলায় বসে পড়েছিল, তা সে নিজেও জানে না। আনমনে একটা দূর্বার শীষ দাঁতে কাটতে গিয়েই—

রঘুর চিন্তাটা একলাফে দূরের জগৎ থেকে নেমে এলো মাটিতে। ধানের শীষে ওটা কি? একটা পিঁপড়ে বলে মনে হচ্ছে না? কিন্তু পিঁপড়ে কেন ঘাসের ডগা কামড়ে পড়ে থাকবে? ঘাস-পিঁপড়ে-গরু·····বিদ্যুত চমকের মতো একটা সম্ভাবনা খেলে যায় রঘুর মাথায়, এই পিঁপড়েই স্লিপিং সিকনেসের 'ভেক্টর' বা 'রিজার্ভার' নয় তো?

রঘুর ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙ্গলো অভিজিতের।

—'সাত সকালেই ঠেলাঠেলি! কি ব্যাপার?'

—'কয়েকটা কাঁচের টিউব দরকার। পিঁপড়ে ধরতে হবে।'

ব্যস্ত পায়ে খাট থেকে নেমে পড়ে অভিজিৎ!

—'ব্যাপারটা একটু খুলে বল্ তো। এলাহাবাদ যাবি না?'

—'নিশ্চয়ই। আগে পিঁপড়েগুলো ধরে কেটে দেখি কোন প্যারাসাইট পাওয়া যায় কি না। এলাহাবাদে না ফিরলে কি সেটা সম্ভব!'

●

ঠিক তিন দিন পর এলাহাবাদে অভিজিতের বাড়ীতে রঘু তার 'ঐ ক'দিনের পরিশ্রমের ফলাফল বোঝাচ্ছিল ডাঃ আয়েঙ্গারকে। সে যে যথেষ্ট উত্তেজিত, তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। সে বলছিল—

"আসলে পিঁপড়েগুলোকে ঘাস কামড়ে পড়ে থাকতে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল ঘাসের সঙ্গে পিঁপড়েগুলোও গরুর পেটে যাচ্ছে। এলাহাবাদে

—ঃ ছোটদের মনের মতো বই ঃ—

○ খাগড়াই

সুকুমার রায়ের ছড়ার সঙ্কলন। [৩.০০]

○ কুমির সাহেব

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়া। বহু ছবি। [৩.০০]

○ আষাঢ়ে স্বপ্ন

যোগীন্দ্রনাথ সরকার। বহু ছবি। [৩.০০]

○ মজার ছড়া

ভবাণীপ্রসাদ মজুমদার। রঙিন ছবি। [৫.০০]

○ মজার কবিতা

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। রঙিন ছবি। [৫.০০]

○ ছড়ার দেশে টুলটুল

শৈল চক্রবর্তীর লেখা ও আঁকা। রঙিন। [৬.০০]

○ শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে

শশিভূষণ দাশগুপ্ত। রঙিন ছবি। [৫০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড | কলিকাতা-৯

ফিরে আমার 'এনটোমলজিষ্ট' বন্ধু শ্রীবাস্তবের ল্যাবরেটরীতে পিঁপড়েগুলো পরীক্ষা শুরু করলাম। দেখলাম পিঁপড়ের পাকস্থলীতে প্রচুর 'ই-কোলাই' পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য ঘাসের ডগা কামড়ে থাকা পিঁপড়ের পক্ষেই এ-কথা সত্য, অন্যগুলো সম্বন্ধে নয়। আক্রান্ত জন্তুগুলোর শরীরে এই একই জীবাণু আপনিও পেয়েছিলেন। অনুমান করতে হল এই 'ই-কোলাই'-ই স্লিপিং সিকনেসের কারণ!

ল্যাবরেটরীতে কটা গিনিপিগের শরীরে পিঁপড়ে থেকে পাওয়া 'ই-কোলাই' ঢুকিয়ে দিলাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমার জীবনের আশ্চর্যতম ঘটনাটা দেখলাম—গিনিপিগদের শরীরে স্লিপিং সিকনেসের লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে! ইতিমধ্যে শ্রীবাস্তব কিন্তু খুব দরকারী একটা ফাইণ্ডিং পেয়ে গেল। পিঁপড়েদের কাটতে কাটতে হঠাৎ ওর নজরে পড়ে 'সাবফ্যারিন্‌জিয়াল' স্নায়ুকেন্দ্রে একটা 'ই-কোলাই' স্পট!"

—"অদ্ভুত! ওখান থেকেই তো নার্ভ বেরিয়ে সোজা চলে গেছে পিঁপড়েদের চোয়ালে।" ডাঃ আয়েঙ্গার বললেন।

—"হ্যাঁ, কিন্তু মজা হল, পিঁপড়েগুলোকে আমরা কাঁচের বাক্সে ঘাসপাতার ভেতরে নজরে রাখছিলাম। কিন্তু দেখি কোন পিঁপড়েই ঘাসের মাথা কামড়ে আটকে থাকে না। পরশুদিন কি খেয়াল হলো, পুরো বাক্সটাই রেফ্রিজারেটারে পুরে দিয়ে দুপুরে 'লাঞ্চ' খেতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি তাজ্জব ব্যাপার! পিঁপড়েগুলো সব ঘাসের ডগা কামড়ে পড়ে আছে। বাক্সটা বাইরে আনার খানিকক্ষণ পরে দেখি সবগুলো পিঁপড়েই আবার আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে।"

—"কিন্তু এর ব্যাখ্যাটা কি?" অভিজিত একটু নড়েচড়ে বসল।

—'শ্রীবাস্তবই এর ব্যাখ্যাটা আমায় পরে দিয়ে ছিল। রাত্রিবেলা ঠাণ্ডা; সেইসময় হয়তো 'সাব-ফ্যারিন্‌জিয়াল' স্নায়ুকেন্দ্রে বাসা বেঁধে থাকা প্যারা-সাইটের ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। ফলে হয়ত নার্ভের উত্তেজনা হয়—সামনে তারা যা পায়, চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরে। রোদের তেজ বাড়লে প্যারাসাইট চুপ করে যায়, ওরাও আবার স্বাভাবিক পিঁপড়েদের মতো ব্যবহার করে।

তখনই আমি আপনাদের খোঁজখবর করতে বলেছিলাম গোরুগুলো কোন সময় চরতে যায় সেটা জানতে। আপনাদের রিপোর্টও বলছে যে সব গরু মোষ সকালবেলা চরতে বেরিয়েছিল, তাদেরই রোগটা হয়েছে। যে সব জন্তুগুলো সারাদিন মাঠে চরে, তাদের মধ্যে কিন্তু রোগটা ছড়ায় নি।

ডাঃ আয়েঙ্গার এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এইবার প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন সকলের সামনে—"কিন্তু রিপোর্টে আমরা কি বলব? 'ই-কোলাই' থেকে স্লিপিং সিকনেস হচ্ছে?" সারা ঘরে নিস্তব্ধতা! প্রথম কথা বলল রঘুনাথই।—'আমি অলরেডি পিঁপড়ের স্যাম্পেল পাঠিয়েছি হায়দ্রাবাদ সেলুলার অ্যাণ্ড মলিকিউলার রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে। বিশদ খবরাখবর দু-এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব। তবে এখানে আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে। এখানে তার সবচেয়ে যোগ্য লোক বোধহয় মলি-কিউলার বায়োলজির ডঃ শেষাদ্রি। অভিজিৎ, তোর চিঠি পেয়েই আমার তাঁর কথা মনে হয়েছিল। তুই ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিস নি?'

—'সম্ভব ছিল না। সপ্তাহ তিনেক আগে এলাহাবাদ থেকে লালাপুর-এ বাড়ী যাবার পথে ওঁর জীপ অ্যাকসিডেণ্ট হয়। পাঁজরা ভেঙ্গে নার্সিং হোমে পড়ে আছেন ভদ্রলোক।'

—'ইস্! এতদূর এগিয়েও তাহলে'—

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অভিজিৎ। 'তবুও তুই একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারিস। শ্রীবাস্তবকে নিয়ে যাস, ওকে তো ডঃ শেষাদ্রি নিজের ভাইয়ের মতো ভালবাসেন!'

●

'টাচউড' নার্সিং হোমের দোতলায় কোণের দিকে একটা ঘর। সামনে লাগোয়া একটা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে সেখানে বসেছিলেন ডঃ শেষাদ্রি। একমাথা এলোমেলো চুল, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ডঃ শেষাদ্রিকে দেখেই রঘুর মনে হল ওঁর উপর দিয়ে যেন একটা দুর্ভাবনার ঝড় বয়ে গেছে।

তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে রঘুনাথ বললো—"ডঃ শেষাদ্রি, আপনার কাছে একটা সাজেশন্ নিতে এসেছি। আমি কতগুলো 'ই-কোলাই'-এর ডি-এন-এ-র গঠন বিশ্লেষণ করাতে চাই। এখানে এ কাজ কে করতে পারবেন? অবশ্য আপনি যদি সুস্থ থাকতেন, আমাদের কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু"—

হাত তুলে রঘুকে থামালেন ডঃ শেষাদ্রি।

—'ক্যাটল-এপিডেমিকের পেছনে আমার মস্ত একটা ভুল কাজ করেছে। শ্রীবাস্তব, আমি তোমাকে যোগাযোগের বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভাঙ্গা পা'—

'কি হয়েছে বলুন তো—আপনি এইভাবে আমাকে খুঁজছেন জানলে'—

'আমি একটা ভুল করেছি শ্রীবাস্তব—মারাত্মক ভুল। বলছি, সবই খুলে বলছি—না বলে আমি স্বস্তি পাবো না। ওয়ার্লড হেলথ অরগানাইজেশন থেকে একটা প্রজেক্ট আমার কাছে এসেছিল বছর দেড়েক আগে—স্লিপিং সিকনেস্ সংক্রান্ত প্রবলেম। আমি কাজ শুরু করেছিলাম 'ট্রাইপ্যানোসোমা

ব্রুশেই' নিয়ে যেটা কিনা গবাদি পশুর স্লিপিং সিকনেসের জন্য দায়ী। ট্রাইপ্যানোসোমার বাইরের দেওয়ালটা বিশেষ এক ধরণের জিনিষ দিয়ে তৈরী যার নাম গ্লাইকোপ্রোটিন। এই গ্লাইকোপ্রোটিনের বিরুদ্ধে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ বা ইমিউনিটি কাজ করে।'

রঘু বলল 'হ্যাঁ, স্লিপিং সিকনেসের প্রবলেমটা তো ওখানেই। ট্রাইপ্যানোসোমার বিচিত্র স্বভাব হলো ওরা যখন তখন ওদের ঐ গ্লাইকোপ্রোটিন আবরণীর স্বভাবচরিত্র পাল্টাতে পারে। বারবার স্বভাব পাল্টানোর দরুণ ওদের বিরুদ্ধে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে না, ফাঁকতালে পরজীবিরা শরীরের মধ্যে ঢালাও বংশবিস্তার করে চলে। কিন্তু আপনার গবেষণা'—

—"আমার কাজটাও ছিল তাই। যে বিশেষ 'জীনে'র প্রভাবে ঐ গ্লাইকোপ্রোটিন তার স্বভাব বদলায় আমি সেই জীনে'র স্বভাবটা বদলে দিতে চেয়েছিলাম। আমার মাথায় আর একটা পরিকল্পনাও ছিল যে 'জীনে'র প্রভাবে ট্রাইপ্যানোসোমা তার বিশেষ ক্ষতিকর 'টক্সিন' বা বিষ তৈরী করে, সেই জীনটাকে খুঁজে বার করে নষ্ট করে দেওয়া। বুঝতেই পারছো, দুটোর মধ্যে যে কোন একটাতে সফল হতে পারলেই স্লিপিং সিকনেসের কনট্রোল আমাদের হাতে এসে যাবে!"

ডঃ শেষাদ্রির কথাগুলো রঘুর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কি অসাধারণ চিন্তা! প্যারাসাইট তার নিজের পরিচিতি পাল্টাচ্ছে তাই তারা শরীরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। ডঃ শেষাদ্রির পরিকল্পনা যদি বাস্তব রূপ পায়, ট্রাইপ্যানোসোমা তার বহুরূপী সাজার ক্ষমতা হারাবে! আর পরজীবি যদি তার টক্সিন-ই না তৈরী করতে পারে তাহলে তা থেকে কখনই স্লিপিং সিকনেস হবে না!

অভিভূত ভাবটা কাটিয়ে রঘু প্রশ্ন করলো—'আপনার কাজ কতটা এগিয়েছিল?'

—"খুব কম নয়। গ্লাইকোপ্রোটিন আবরণীর বহুরূপী সাজার জন্য দায়ী যে 'জীন' তার ডি এন এ'র গঠনে কিছু ওলটপালট আনা—অর্থাৎ যে সংকেত ডি এন এ'র মধ্যে থাকার দরুণ আবরণীর গ্লাইকোপ্রোটিন তার স্বভাব পাল্টাচ্ছিল, সেই সংকেত মুছে ফেলাই ছিল আমার কাজ। বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন মাত্রায় রেডিয়েশন, রিকম্বিনেন্ট ডি-এন-এ পদ্ধতি—এইসব নিয়ে কাজ চলল। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানো, ডি-এন-এ-তে কি পরিবর্তন ঘটলো, তার কাজ করার ক্ষমতা পাল্টালো কি না এটা বুঝতে হলে তাকে আবার অন্য কোন প্রাণীতে ঢুকিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে হয়? পরীক্ষার এ ধাপটা অত্যন্ত কষ্টকর। ডি-এন-এ-কে অন্য কারুর সঙ্গে না জুড়লে সে অপরিচিত কোন কোষে ঢুকতে পারে না। আমি ঠিক করলাম পরিবর্তিত 'জীন'টা 'ই-কোলাই' ব্যাকটেরিয়ার শরীরে ঢুকিয়ে দেব। এর জন্য বাহন ঠিক করলাম 'ই-কোলাই'-এর স্বাভাবিক শত্রু 'ল্যামডা' ভাইরাসের ডি-এন-এ। এর পর চলল আরও কাজ। ল্যাবরেটরীতে 'কালচার' করে 'ই-কোলাই'দের বংশবৃদ্ধি চালাতে লাগলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে 'ই-কোলাই'দের আবরণীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ চলতে লাগলো। দেখলাম তা বহুরূপী সাজার ক্ষমতা হারিয়েছে।"

ডঃ শেষাদ্রি একটু থামলেন। সেই সুযোগে রঘু বলল—'কিন্তু এই 'ই-কোলাই'তো প্রাণীদের মধ্যে বেঁচে নাও থাকতে পারে?'

—'হ্যাঁ, সেই পরীক্ষা করবার জন্যেই বেশ কিছু পিঁপড়ের মধ্যে আমি এটা সংক্রমিত করি। দেখবার

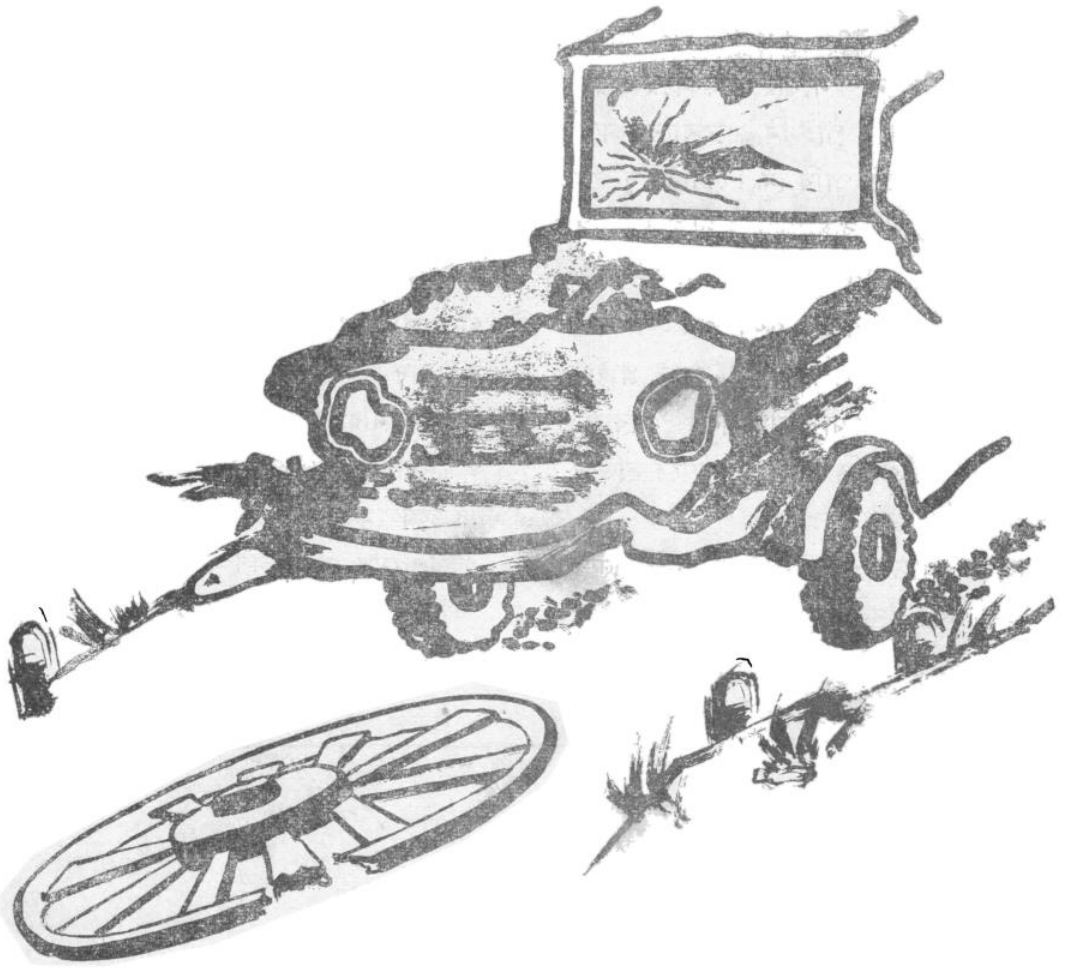

ইচ্ছে ছিল প্রাণীদের মধ্যে এরা স্বাভাবিকভাবে বংশবৃদ্ধি করে কি না। পরীক্ষা যদি সফল হয়, ঐ পরিবর্তিত 'ই-কোলাই' থেকে স্লিপিং সিকনেসের প্রতিষেধক টীকা তৈরী করা যেতে পারে।'

ডঃ শেষাদ্রি চশমার পুরু কাঁচদুটো একবার মুছে নিলেন।

"শরীরে একটা জীবানু ঢুকে থাকলে সেই ধরণের দ্বিতীয় কোন জীবানু চট করে শরীরে ঢোকে না। 'ই-কোলাই'-এর শরীরে ট্রাইপ্যানোসোমার বিশেষ একটা 'জীন' এর প্রভাবে ই-কোলাই-এর আবরণী গ্লাইকোপ্রোটিন তৈরী হচ্ছে, অথচ এই ই-কোলাইরা বিষাক্ত নয়, কারণ যে জীনের প্রভাবে ট্রাইপ্যানোসোমা 'টক্সিন' তৈরী করে, সেই জীনটা এখানে নেই!'

—'তারপর কি হল?'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ালেন ডঃ শেষাদ্রি।

—"অত্যধিক খাটুনীর জন্য সে সময়টা আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের ডিরেক্টারের পরামর্শে আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিই। কিন্তু ওই সব পিঁপড়ের মধ্যে জীবানুগুলো বেঁচে আছে কিনা, বংশ বৃদ্ধি করছে কিনা, পরীক্ষা করার জন্য আমি কিছু

'ইনফেক্‌টেড' পিঁপড়েকে সঙ্গে নিয়ে আমার লালাপুরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। তার পরের ঘটনা তো তুমি জানো—সন্ধ্যের অন্ধকারে গরুর গাড়ীটা দূর থেকে দেখতে পাই নি, একেবারে কাছে এসে পড়ায় ব্রেক চাপতে পারি নি, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছিলাম। রাস্তার ধারে বড় একটা গাছ ছিল, জীপটা ধাক্কা মেরেছিল—এইটুকুই খেয়াল আছে। ব্যাস! যখন জ্ঞান হল তখন তো এই নার্সিং হোমে, পায়ে পিঠে বুকে প্লাষ্টার করা।' ডঃ শেষাদ্রি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। শ্রীবাস্তব বলল 'তার মানে ঐ পিঁপড়েগুলো মাঠে ছড়িয়ে গিয়ে—কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?'

ডঃ শেষাদ্রি বললেন—'সেইটাই তো আগে বুঝতে পারিনি শ্রীবাস্তব। খবরের কাগজ দেখে আমার মাথায় বাজ পড়লো। ডি-এন-এর সিকোয়েন্স আমি যে উদ্দেশ্যে পালটেছিলাম সেই উদ্দেশ্য সফল হয়ে ছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু এই সিকোয়েন্স পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই ডি-এন-এর টুকরোকে বিশেষ টক্সিন তৈরী করার ক্ষমতা যে আমি দান করেছি—সে কথা তো স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারি নি। যদি এই মারাত্মক সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় আসতো'—

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রঘুনাথ। বলল—'এতো ভেঙ্গে পড়ছেন কেন? দুর্ঘটনার ওপর মানুষের কি হাত থাকে? আপনি গবেষণায় যা পেয়েছেন সেটার যদি ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব হয়, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আপনাকে যোগ্য সম্মান দেবেন'।

ডঃ শেষাদ্রি কথা বলতে পারছিলেন না। শুধু একবার উজ্জ্বল মুখ তুলে তাকালেন বাইরের দিকে।

একখণ্ড মেঘ অনেকক্ষণ ধরে আকাশটাকে থমথমে করে রেখেছিল। সেটা সরে গিয়ে চনমনে আলোয় ভরে গেল সারা ঘর।

With compliments from

Phone : 21-2834
24-9997

EASTERN CREATIVE WORKSHOP

4, Chowringhee Mansion
30, Jawaharlal Nehru Road
Calcutta-700016.

সাপের যম !

অসীম চক্রবর্তী

সাপের যম কে ?

জানি, তোমরা সবাই বলবে—'বেজী'। সাপ নেউলের কথা মুখে মুখে ফিরলেও সাপের দুষমন কিন্তু কেবল বেজী-ই নয়, লিষ্টি বানালে তাতে ময়ূর, বাজপাখী, সজারু—এমনি সব নানা নাম এসে যাবে। এইসব প্রাণীদের কিছু কিছু গল্প বরং তোমাদের শোনাই।

কয়েক বছর আগে সোনারপুর অঞ্চলে একবার সাপ আর বেজীর লড়াই দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। চোখে না দেখলে বোঝা যায় না কি অসাধারণ ক্ষিপ্রতা নিয়ে বেজী সাপের সঙ্গে লড়াই করে। সাপ যতবারই ছোবল দিতে যায়, বেজীও কেবল তাকে এড়িয়ে পাশ থেকে কামড় বসায়। আমার চোখের সামনে বেজীটা মাত্র পনের-বিশ মিনিটেই সাপটাকে টুকরো টুকরো করে খতম করলো। অনেকে বলেন —'হবেই তো, বেজীরাতো আর সাপের কামড়ে মরে না, ওরা গাছ-গাছড়া চেনে—সাপ কামড়ালে দৌড়ে গিয়ে আশপাশের গাছ চিনে তার পাতা-শেকড় খেয়ে আসে।' ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। গাছ-গাছড়ার শেকড়ে মোটেই সাপের বিষ নামে না, আসলে বেজীর ক্ষিপ্রতার জন্য সাপের ছোবল তার গায়েই লাগে না। আর লাগলেও পুরু লোমের ফাঁক দিয়ে সে কামড় চামড়ায় পৌঁছায় না।

এর পর বলি সেই জন্তুটার কথা, যেটা কচু খেতে খুব ভালবাসে আর গ্রামেগঞ্জে রাত্রিবেলা ক্ষেতের ধারে 'ঝম্‌ঝম্' শব্দ করে। তাক করে কলাগাছের গোড়া ছুঁড়ে মারলেই—

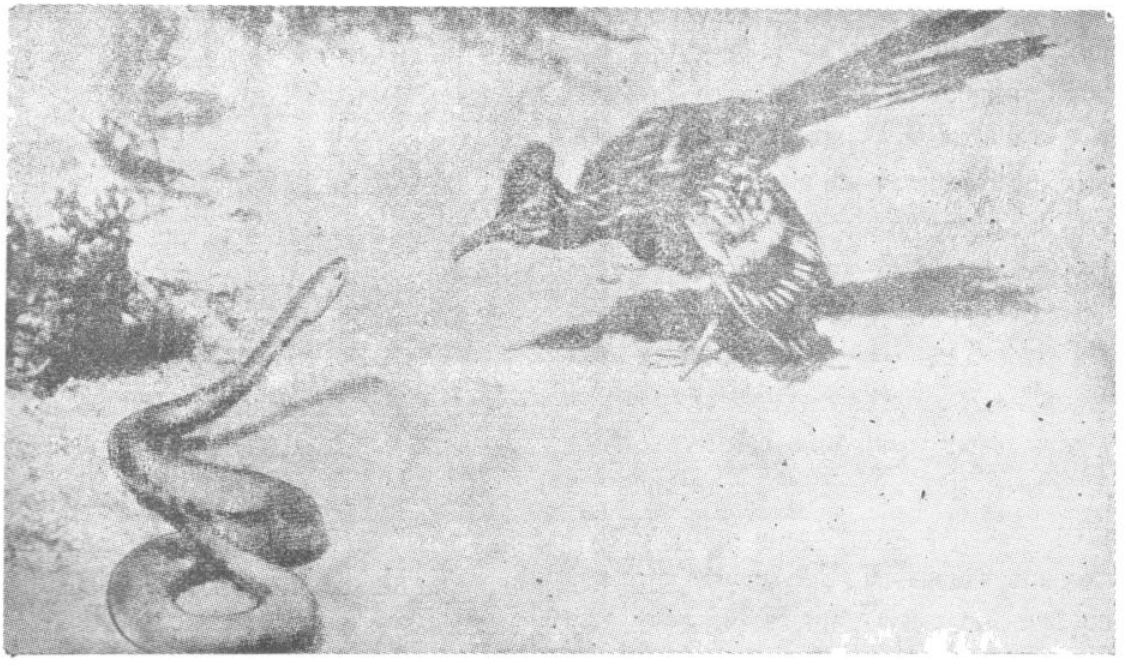

ব্যস ! ব্যস ! আর বলতে হবে না। তোমরা নিশ্চয় বলবে শজারুর কথা আমরা সবাই জানি। আসলে এই শজারুও সাপ চিবিয়ে খেতে পারে অক্লেশে। শুধু সাপ নয়, এরা বাগে পেলে ছোটখাট পাখী, শামুক এমন কি আরশোলা পর্যন্ত খায়। কি ভাবছো ? বাড়ীতে শজারু পুষবে নাকি, তাহলে আর আরশোলার উৎপাত হবে না ! উঁহু, সেটি

হচ্ছে না, সজারু ধরতে গেলেই গুটিয়ে 'কাঁটাওয়ালা বল' হয়ে যাবে, কাছে ঘেঁসে কার সাধ্য? তাছাড়া এরা বড্ড নোংরাও বটে। ডক্টর বাকল্যাণ্ড বলে এক প্রাণীতত্ত্ববিদ একবার মজা করে শজারুর ঘরে একটা সাপ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই শজারুটা সাপটাকে কচমচ করে কামড়ে খেয়ে ফেলল্। বেচারা সাপ কি করবে? কাঁটার বর্ম ভেদ করে বিষ ঢালা যায় নাকি?

দেশী পাখীদের মধ্যে বাজ, ধনেশপাখী সাপ মারতে পারে। আর পারবেই না বা কেন? ঐরকম ঠোঁটের একটা ঠোক্কর খেলে সাপ আর ত্রিসীমানায় ঘেঁসবে না। ময়ূরও কিন্তু সাপের যম! এদেরও ঠোঁটে ভয়ানক জোর।

এই যে যাদের কথা বললাম তারা তো তোমাদের চেনা পাখী। এবার এসো, তোমাদের কম চেনা দু-একটা 'সাপ খেকো' পাখীর কথা বলি। এদের একজন হল 'রোড-রানার'। মেক্সিকোতে বড় রাস্তার ধারে এদের প্রায়ই দেখা যায়। এরাও সাপের এক নম্বর শত্রু। র‍্যাটল সাপের মতো বিষধর সাপকেও ছেড়ে কথা বলে না এরা! সারসের মতো দেখতে আর একটা পাখী সাপ খায়—এর নাম 'সেক্রেটারী বার্ড'। এরা সাপকে খুঁচিয়ে আগে ক্ষেপিয়ে দেয়। এরপর সাপটা যখন ক্ষেপে গিয়ে ছোবল মারে, তখন ওরাই ডানাটা পেতে ছোবল নেবার ভান করে, সাথে সাথে ঠোঁট দিয়ে সাপের টুঁটি চেপে ধরে একেবারে খতম করে দেয়!

আচ্ছা তোমরা কেউ ব্যাঙকে সাপ খেতে দেখেছ? তোমরা ভাবছ—ধ্যাৎ, তাই হয় নাকি? উল্টোটাই তো জানি! আমি কিন্তু মিথ্যে কথা বলছি না। এক ধরণের রাক্ষুসে ব্যাঙ আছে যার নাম :Ceratophrys cornuto। বাগে পেলে এরা ছোটখাট সাপকেও গিলে খায়! সাপে সাপ খায় এ ঘটনা বোধহয় তোমরা জান। চিড়িয়াখানার কুলীন সাপ যারা, কেউটে চন্দ্রবোড়া এইসব—এদের খাদ্যই হল ঢোঁড়া, হেলে বা ঐ ধরণের ছোট সাপেরা। কিছুদিন আগে ডানকুনির গরলগাছা গ্রামে এক চন্দ্রবোড়া ও শাঁখামুটির লড়াই দেখতে লোক জমে যায়। লড়াই-এ চন্দ্রবোড়া জেতে ও শাঁখামুটিকে খেতে শুরু করে। মজার কথা হল—দুটোই কিন্তু বিষধর সাপ।

সত্যি বললে, সাপের সবথেকে বড় শত্রু বোধহয় মানুষ। বেদে বা সাপুড়েদের পেশাই হল সাপ ধরে তার বিষটা বিক্রি করা। ভাবছ নিশ্চয়ই—সাপের বিষ আবার কে কেনে? শুনলে অবাক হবে, সাপের বিষ থেকেও নানা প্রাণদায়ী ওষুধ তৈরী হয়। সাপের বিষ নিয়ে নানারকম গবেষণাও হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন গবেষণাগারে—উদ্দেশ্য, সাপের বিষ থেকে নানা নতুন ওষুধ তৈরী করা। প্রায় সব গবেষণাগারই কিন্তু বিষের জন্য সাপুড়েদের উপর নির্ভরশীল। 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে'—কথাটা যতই বলা হোক না কেন, তবু সাপও সুযোগ পেলে তার 'যমদের'ও বেকায়দায় ফেলে, সময় সময় মরণ কামড়ও বসিয়ে দেয়।

Phone 77-2312

BETA

[Registered Scientific Quarterly of the Science Association of Bengal]

104, Diamond Harbour Road, Barisha, Calcutta-700008.

Approved by the Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India.

Subscription Form

NAME

ADDRESS

PIN

ENCLOSED Rs. 8/ Rs. 16/ Rs. 23 For 1 Yr./ 2 Yrs./3 Yrs.

DATED

Signature

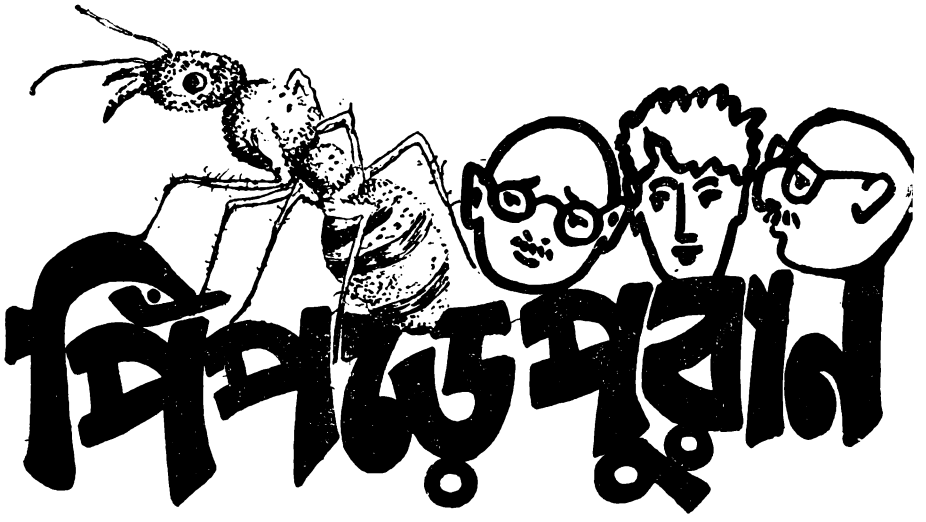

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল—তারপরই ছ'ফুট লম্বা পিঁপড়েরা আন্দিজ পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে ওখানকার মানুষদের তাড়ায় প্রথম আক্রমণ হয় ৭৯৫৭ সালে। ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিটিউডের পশ্চিম ধারে দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান শহরগুলো হঠাৎ একদিনে ধ্বসে পড়ে।]

আশ্চর্যের কথা এই যে, পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের পরেও দক্ষিণ-আমেরিকার অন্যান্য দেশ তেমনভাবে সাবধান হয়নি। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, প্রথম আক্রমণের পর দু'বছর পর্যন্ত তাদের আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। হঠাৎ দু'বছর বাদে একদিন মাঝরাতে ৫২ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিমে সমস্ত শহর ধ্বসে পড়ে। এই লঙ্গিচিউড ধরে পিঁপড়েদের আক্রমণ আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার! এবারেও সেই আগেরবারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। শুধু অরিনকো নদীর ধারে বলিভার নগরের লোকেরা আগে থেকে সন্দেহ ক'রে শহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ নিয়ে জড়ো হয়েছিল। তারাই কেবল যুদ্ধ ক'রে মরবার সৌভাগ্য পেয়ে ছিল। এই যুদ্ধে প্রথম পিঁপড়েদের অদ্ভুত অস্ত্রের ও তাদের যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের শেষে কয়েকজন মাত্র বলিভার-নগরবাসী নদী দিয়ে মোটর-লঞ্চে অ্যাটলান্টিক সাগরে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

পিঁপড়েরা যে-অস্ত্র ব্যবহার করে, তাকে খুব ভয়ঙ্কর একরকম বোমা বলা যেতে পারে কিন্তু বোমা প্রয়োগ করার রীতিটাই সবচেয়ে অদ্ভুত। বলিভার-নগরবাসীরা বলেন—'যখন তীর থেকে বহু উড়ন্ত পিঁপড়েকে গোল-গোল একরকম জিনিস নিয়ে আমাদের দিকে উড়ে আসতে দেখি, তখনই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। অনেক পিঁপড়ে এইভাবে মারা পড়ে, কিন্তু দু'-একটা পিঁপড়ে সমস্ত গোলা-গুলি এড়িয়েও আমাদের জাহাজ-নৌকোতে এসে পড়ে। তাদের পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বোমা ফেটে জাহাজ-নৌকো সব গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক বোমার সঙ্গে একটি ক'রে পিঁপড়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়। দূর হতে বোমা নিক্ষেপ ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তারা রাখে না।"

পিঁপড়েদের দ্বিতীয় আক্রমণের পর সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে ওঠে। চীনের পিকিন শহরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলে কর্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ, এরোপ্লেন ও সৈন্য দক্ষিণ-আমেরিকার বাকি দেশগুলির অধিবাসীদের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? পিঁপড়েদের আস্তানার কোনো পাত্তাই কেউ পায় না। মাটির তলায় কোথা দিয়ে তাদের গতিবিধি, সমস্ত আমেরিকা খুঁড়ে না ফেললে তা জানবার উপায় নেই। সৈন্যেরা দিনের পর দিন, ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে তন্ন-তন্ন ক'রে সমস্ত খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন হঠাৎ এক জায়গায় গভীর-রাত্রে তাদের পায়ের তলায় মাটি ধ্বসে পড়ে। সকালবেলা তাদের আর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনের দল ঝাঁকে-ঝাঁকে দক্ষিণ-আমেরিকার আকাশে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। পিঁপড়েদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনগুলিরও কোনোমতে আট-হাজার ফিটের নিচে নামবার উপায় নেই, কোথা থেকে একশো এরোপ্লেনের জায়গায় হাজার-হাজার উড়ন্ত পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করে।

পিঁপড়েদের সঙ্গে এরোপ্লেন নিয়ে লড়াই করা শক্ত। একটাকে মারতে একশোটা এসে ছেঁকে ধরে। সবচেয়ে মুস্কিল, তারা এরোপ্লেনের ঘূর্ণ্যমান পাখার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে অচল ক'রে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজেরাও মরে।

আট হাজার ফিট ওপর থেকে পিঁপড়েদের কোনো সন্ধানও মেলে না।

এদিকে মাটির ওপর বাকি সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকা তখন প্রাণপণে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। যেখানে যে শহর ছিল, সমস্ত শহরের লোক শহরের বাইরে নতুন ক'রে ঘর বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করলে। কখন যে কোন্ শহর ধ্বসে পড়ে, তার ঠিক কি? পিঁপড়েরা কবে থেকে কোন্ শহরের তলা ফোঁপ্‌রা করে রেখেছে, তা কে বলতে পারে?

(চলবে)

কোনো সময়ে···

স্কটিশ বিজ্ঞানী জন হান্টারের ক্লাস ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল, কেউ পালাতো না, একটু অমনোযোগীও হোতো না, সেই হান্টারই একদিন অ্যানাটমির ক্লাস নিতে এসে দেখলেন-সব ভোঁ ভাঁ। একটি মাত্র ছেলে ক্লাসে বসে। হান্টার আপন মনেই বললেন—অসম্ভব! মাত্র একটা ছেলের কাছে বক্ বক্ করে আমি কিছুতেই এতটা সময় নষ্ট করতে পারি না। বলে হান্টার গটমট করে বেরিয়ে গেলেন। আর তারপর একটি কংকাল নিয়ে এসে ক্লাসে ঢুকলেন। কংকালটিকে ছাত্রটির পাশে বসিয়ে দিলেন তিনি। "আমার প্রিয় ছেলেরা—আজ আমি তোমাদের কাছে শরীরের গঠন সম্পর্কে বিশেষ কিছু নতুন কথা বলব।"···হান্টার পড়াতে শুরু করলেন। * * *

ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কক্ষ। আপন মনে কাজ করে চলেছে এহরলিক। এমন সময় সেখানে অধ্যাপক এলেন তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে; সঙ্গীকে বললেন—"এই যে এহরলিককে দেখছো—ছেলেটির কাজেকর্মে যতই মন থাকুক না কেন, এ কোনওদিনও পরীক্ষায় তেমন ভাল ফল করতে পারবে না। এর দ্বারা কিছু হবে না।"
এহরলিক কিন্তু পরীক্ষায় এত বেশী নম্বর পেয়েছিল যে অধ্যাপক একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। আর ভবিষ্যতে?
পল এহরলিক জার্মানের রয়াল ইনষ্টিটিউট ফর এক্সপেরিমেণ্টাল থেরাপির ডিরেক্টর হন। জীবাণুসংক্রান্ত গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্যে বিজ্ঞানী ককের সঙ্গে যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার পান।
এহরলিকের গবেষণালব্ধ ফলকে আজ বিজ্ঞানীরা কাজে লাগিয়েছেন ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায়।

ধাঁধা

গুণধর ভারী মুসকিলে পড়েছে, বুদ্ধির খেলায় হাঁদার কাছে হেরে যাবে না কি? দশটা বাক্স আছে। প্রত্যেকটা বাক্সে দশটা করে মার্বেল আছে। প্রতিটি মার্বেলের ওজন দশগ্রাম। কিন্তু না, সবকটা বাক্স একরকম না। একটা বাক্সে নাকি এমন দশটা মার্বেল আছে যার প্রত্যেকটার ওজন এগারো গ্রাম!

হাঁদা চট্ করে একটা দাঁড়িপাল্লা আর ওজনের বাক্স এনে গুণধরকে বললো—'একবার মাত্র ওজন করে বল দেখি কোন বাক্সে ভারী মার্বেলগুলো আছে?' তোমরা একটু চিন্তা করে বল দেখি—গুণধর কি করবে?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর ডায়াটম

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম:

অভিজিৎ কুমার দে, হরিপাল; রুচিরা ও অনির্বাণ গুপ্ত, শিবপুর; কাজল, নিদ্রা, সঞ্জীব ও সঞ্জয় সরকার, চম্পা, মুনমুন, মীরা দাস, প্রদীপ, প্রতিভা দে, শিখা ঘোষ ও সুকুমার শীল; স্বাতী ও সুনন্দা মিশ্র, কল্যাণী; কৃষ্ণা ও পূর্ণিমা বসু, বেলঘরিয়া; লিলি ও রমা কুণ্ডু, তপতী, মাণু ও পিকলু, দমদম; প্রভুদান হালদার, ২৪ পরগনা; প্রবীর মণ্ডল, মেমারী।

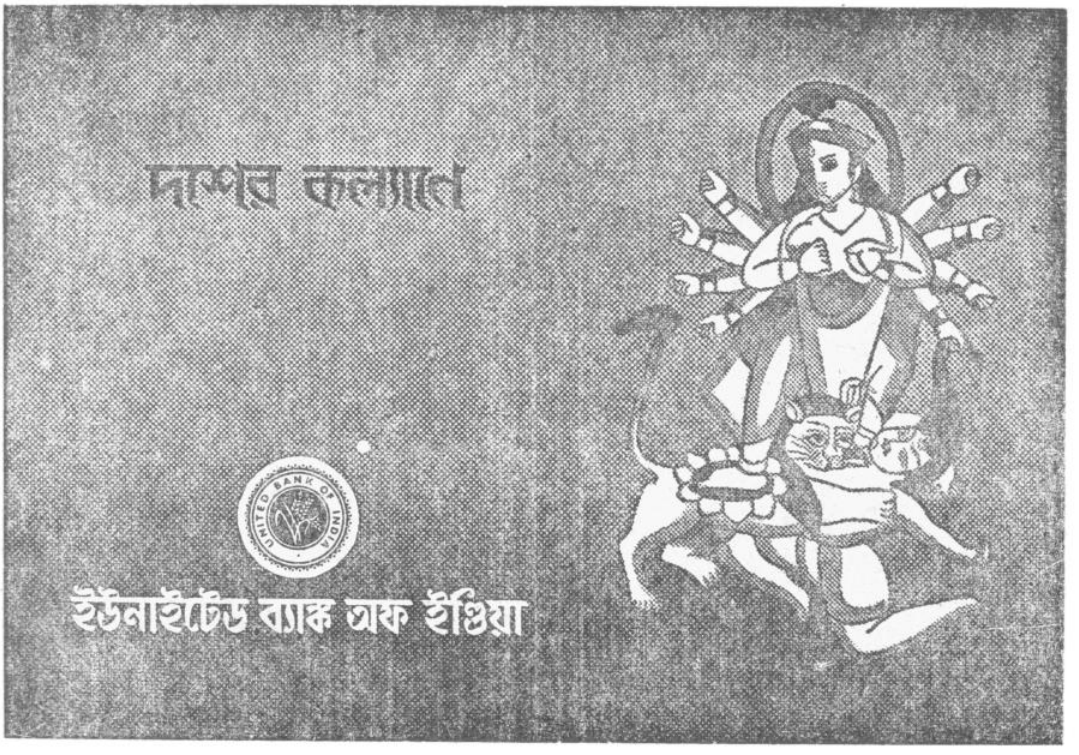

With
the
Compliments
of

BRICKSTON & STEEL

Mugra Road.

Agartala

A WELL WISHER

BIJNAN MELA SEPTEMBER/OCTOBER, 1981 Re 3·00

Post Regd WB/SC-200 Regn. No.—R. N. 37306/81

..... AND HERE IS YOUR ULTIMATE SOLUTION TO HAIR CARE

SURYA COCOANUT OIL

(HYGENIC & NATURAL PERFUMED)

Manufacturer :

Surya Cocoanut Oil Industries

S. M. BOSE ROAD,

P.O. Agarpara, 24 Paraganas.

With

best

Compliments

from :

RAJKISSEN RADHAKISSEN MITRA & CO.

P-40, MISSION ROW EXTN.

Calcutta-700013.

Published by Mrinal Saha from 8/5, Hingan Jamadar Lane, Cal.-700046 and Printed by Satyanarayan Press, 1, Ramaprasad Roy Lane, Cal.-700006.